সবুজ কথা

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

আশ্বিন, ১৩২৮
প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশিং হাউস,
চন্দননগর

চন্দননগর, বোড়াইচণ্ডীতলা,
প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস হইতে
শ্রীরামেশ্বর দে
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

[illegible]

উৎসর্গ

বাংলার

তরুণ তরুণী

যাদের উৎসাহ আছে আশা আছে

অতীতের বোঝা

যাদের প্রাণ হ'তে

নবীন নবীন স্পন্দনের অনুভূতিকে

দূর করে' রাখ্‌তে সক্ষম হয় নি

তাদের হাতে

এই গ্রন্থ

অর্পণ

করলুম।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত

১। নবযুগের কথা ... ৸৹

২। নতুন রূপকথা ... ১৲

৩। ইরাণী উপকথা ... ১।০

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত

১। পূর্ণযোগ ... ।০

২। দেবজন্ম ... ১৲

৩। সাহিত্যিকা ... ১।০

৪। নারীর কথা ... ১।০

বিজ্ঞাপন

সবুজ কথার প্রবন্ধগুলি পূর্ব্বে বিভিন্ন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে 'নারীর উক্তি' নারায়ণে—'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়', 'বীরবল', বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ও 'ঘরে বাইরে'—এই চারটি প্রবাসীতে এবং বাকি সবগুলিই সবুজপত্রে বার হয়। ইতি—

গ্রন্থকার

২০এ সেপ্টেম্বর, ১৯২০

BOOKS BY SRI AUROBINDO GHOSE.

1.	The Renaissance in India.	...	Rs. 1-12-0.
2.	The Ideal of the Karmayogin	...	Rs. 1-12-0.
3.	The Yoga and its Object	...	As. 8-0.
4.	Uttarpara speech	...	As. 4-0.

১।	অরবিন্দের পত্র	...	।৵০
২।	ধর্ম্ম ও জাতীয়তা	...	১॥০
৩।	গীতার ভূমিকা	...	১।০
৪।	কারাকাহিনী	...	১।০
৫।	পণ্ডিচারীর পত্র	...	৵০
৬।	জগন্নাথের রথ	...	যন্ত্রস্থ

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত

নতুন রূপকথা

সবুজপত্র-সম্পাদক

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের ভূমিকা সমেত।

প্রমথবাবু বলেন—

"সাহিত্যের গুণ ভাষার রূপের উপরই প্রধানত নির্ভর করে।··· সুরেশচন্দ্রের ভাষা বর্ণাঢ্য। তিনি বাক্যের গঠনের উপর ততটা ঝোঁক দেন না, যতটা দেন পদের বর্ণের উপর। তিনি সেই সব শব্দ বেশী ব্যবহার করেন যা শুনলে আমাদের চোখের সুমুখে ছবি ফুটে ওঠে। তাঁর ভাষার দ্বিতীয় গুণ, তার ঐশ্বর্য্য—ভাষা প্রয়োগে তাঁর কোনরূপ কার্পণ্য নেই। তাঁর রচনার ভিতর কথা সব ভিড় করে আসে, পরস্পর ঠেলাঠেলি করে গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে যায়।······এই রূপকথা ঢুটি একটি জ্যান্ত মানুষের, জ্যান্ত মনের, জ্যান্ত ভাষায় আত্মপ্রকাশ, অতএব এ যথার্থ সাহিত্য।"

ভালো এন্টিক কাগজে, বড় বড় অক্ষরে পরিষ্কার ছাপা ও বাঁধাই।

দাম এক টাকা

সূচী

ভারতবর্ষ	১
'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'	১১
'অচলায়তন'	২৩
'পঞ্চক'	৩৬
শক্তিমানের ধর্ম্ম	৪৭
একটি প্রেমের গান	৬৩
'নারীর উক্তি'	৭৩
অবরোধের কথা	৯৪
'বীরবল'	১০৯
বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা	১২৫
'ঘরে বাইরে'	১৩৯
নূতন ও পুরাতন	১৫২

সবুজ কথা

ভারতবর্ষ

মানসী মূর্ত্তি

যে দিন জলধিগর্ভ হ'তে ভারতভূমি আপনার মস্তক উত্তোলন করলেন সে দিন বুঝি অন্তরীক্ষে অন্তরীক্ষে দেবতারা সহর্ষে আনন্দ-ধ্বনি করে' তার আবাহন করেছিলেন—আকাশ পথে দিব্যাঙ্গনারা বিচরণ করতে করতে থেমে গিয়ে তাঁদের আনন্দ-পুলকিত আঁখি নত করে' একবার চেয়ে দেখেছিলেন—গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ রক্ষ শূন্যপথে সব মিলিত হ'য়ে কৌতূহলোদ্দীপ্ত-চিত্তে জোড়-করে এ ধরিত্রীর পানে চেয়ে প্রণত হয়েছিল। সেদিন উর্দ্ধে অধঃ, পূর্ব্বে পশ্চিমে ঘোষিত হ'য়ে গিয়েছিল যে এই ভারতবর্ষে বিশ্বমানবের এক মহালীলা সংঘটিত হবে।

* * * *

তারপর কে জানে কতযুগ ধরে' লোকচক্ষুর অন্তরালে জগৎ-জননী ভারতভূমি, আপনার অন্তর বাহির অতুল ঐশ্বর্য্যে ভরে'

তুলেছিলেন—আপনার লোভাতুর সন্তানদিগকে আপনার বুকে ভুলিয়ে আন্‌বার জন্যে। পদতলে তাঁর সফেন-তরঙ্গ পাগল সিন্ধুর অতল তলে কোটি কোটি শুক্তি-হৃদয় মুক্তায় মুক্তায় ভরে' উঠ্‌ল—খনিতে খনিতে কত মণি মাণিক্য লালসাময় জ্যোতি বিকীরণ করে' চক্‌মক্ করে' উঠ্‌ল—কলনাদিনী গঙ্গা, সিন্ধু, কাবেরীর তীরে তীরে স্নিগ্ধ-শ্যামল বৃক্ষ-তল সুস্নিগ্ধ ছায়ায় ছায়ায় ভরে' গেল—বসুমতী আপনার বুক চিরে অনন্ত স্নেহরসে অভিষিক্ত অপর্য্যাপ্ত অন্নদান করবার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

*　　*　　*　　*

তারপর কে জানে কোন্ সুদূর অতীতের একদিন, কোন্ এক চিরতুষারাবৃত, চিরকুয়াশাচ্ছন্ন দেশে জগত-জননী ভারত-মাতার প্রথম আহ্বান গিয়ে পৌছল। মানুষের স্মৃতির পটে বিলুপ্ত-প্রায় সেই অভিযান-কাহিনী কে জানে? কে জানে কত মরুর নিষ্ঠুর বক্ষের উপর দিয়ে, কত কত পর্ব্বত মালার দুরারোহ অভ্র-চুম্বিত চূড়া অতিক্রম করে', কত গহনবন কান্তারে গোপন পথ খুঁজে খুঁজে, কত বৎসর পরে এই কল-নাদিনী নদী-সিক্ত ছায়া-স্নিগ্ধ জগন্মাতার শ্যামল-বুকে নিবিড় নীল আকাশের তলে পৌছে গিয়েছিল, মানবসভ্যতার সেই প্রথম পুরোহিতের দল—উন্নত শির, প্রশস্ত ললাট, বিশাল বক্ষ, তেজোপুঞ্জ দৃষ্টি, সরল সবল কলেবর। মানব-সভ্যতার প্রথম পুরোহিত ব্রাহ্মণ-বেশে জগন্মাতার বুকে এই বিশ্বমানবের মহালীলার প্রাঙ্গনে প্রবেশ করল।

*　　*　　*　　*

ভারতবর্ষ

আজ আমি আমার মানস নয়নে দেখ্‌তে পাই যে সেই চির-তুষারাবৃত চিরকুয়াশাচ্ছন্ন দেশ ছেড়ে যে দিন সেই সিন্ধুতীরে তাঁদের চোখের সামনে পূর্ব্ব-দিগন্ত কনক রাগে রঞ্জিত করে', জবাকুসুম-সংকাশ কাশ্যপেয় মহাদ্যুতি ধীরে ধীরে দিক-চক্রবালের নীচ থেকে আপনাকে তুল্‌লেন, সে দিন কি এক অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়ে তাঁদের চিত্ত মন প্রাণ সব ভরে' উঠেছিল। সেই মহাদ্যুতির করস্পর্শে পৃথিবীর অন্ধকার দূর হ'ল। মানুষের মনের অন্ধকার দূর হবার সূত্রপাত হ'ল সে দিন, বিশ্বমানব ইতিহাসের সে এক জ্যোতির্মণ্ডিত চিরস্মরণীয় দিন।

* * * *

হিন্দুর সেই একদিন গিয়েছে যে দিন পঞ্চনদতীর-ভূমে বনে বনে তাপস-কবির আনন্দোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সাম গান শুনে তরু লতা মঞ্জরিত হ'য়ে উঠ্‌ত—বৃক্ষে বল্লরিতে ফুল ফুটে উঠ্‌ত। সেই ছায়া-সুনিবিড় বনে বনে সারা দ্বিপ্রহর আর মধুপ-গুঞ্জনের বিরাম নেই—বনকপোতের প্রাণ-উদাস করা ডাকের আর অন্ত নেই—বৃক্ষতলে শুষ্ক পত্রপুঞ্জে মর্ম্মর ধ্বনি তুলে সর্ সর্ করে' বাতাসের আনাগোনার আর বিরতি নেই;—সেই বনভবনে শান্তি-সমাকুল পর্ণকুটীরে কত কত ঋষি এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটন কর্‌বার জন্যে ধ্যান-নিরত। হিন্দুর জীবনের ইতিহাসে সেই একদিন গিয়েছে।

* * * *

ধীরে ধীরে—ধীরে ধীরে মানুষ আপনাকে চিন্‌ল—আপনার অধিকার বুঝ্‌ল। আনন্দে বিশ্বাসে শ্রদ্ধায় তাদের সকল হৃদয়

ভরে' উঠ্‌ল। তাদের কণ্ঠ-সঙ্গীত পঞ্চনদের তীরে তীরে ছায়া সুনিবিড় বনে বনে অনন্ত আকাশকে মুখরিত পুলকিত আকুলিত করে' তুল্‌ল। আপন প্রাণের অদম্য আনন্দ-উচ্ছ্বাসে তারা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন কর্‌লে। অন্ন আপনাকে বহু কর্‌লেন—প্রজা বহু হ'ল। পল্লী প্রতিষ্ঠা হ'ল—নগর নগরী বিনির্ম্মিত হ'ল—রাজ্য গঠিত হ'ল—সাম্রাজ্য স্থাপিত হ'ল। মানুষ আত্মবলে আপনাকে জয়যুক্ত করে' ভগবানকে সার্থক করে' তুলল।

*　　　*　　　*　　　*

তারপর কত যুগ ধরে' এই জগন্মাতার বুকের উপর একে একে কত লীলা হ'য়ে গেল—কত জ্ঞান শক্তি—ঐশ্বর্য্য সম্পদ—কত মহত্ত্ব গৌরব—কত ঘাত প্রতিঘাত, শান্তি সংগ্রাম—কত রক্তস্রোত কত প্রীতি-ধারার ভিতর দিয়ে, বসুন্ধরা তাঁর সন্তানদিগকে নিয়ে চল্‌লেন—হিন্দুর সে-জীবনের কাহিনী আজ মানবের স্মৃতিতে বিলুপ্ত-প্রায়।

*　　　*　　　*　　　*

অনন্ত অতীতের মসীময় অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীপ্রভাতে, ইতিহাস যখন বিস্মৃতির করাল-কবল হ'তে মানুষের লীলাধারাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার জন্যে উষার ক্ষীণ আলোকে লেখনী-হস্তে বদ্ধ পরিকর হ'ল—তখনও সেই সুদূর অতীতের আধ-আলো আধ-অন্ধকারের মধ্যে তার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় যে আলেখ্য লিখিত হ'ল তা'তে দেখি তখনও হিন্দুর গৌরবের দিন গত হয় নি। তারপর ধীরে ধীরে দিনে দিনে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আলেখ্য-রাজি স্পষ্ট হ'তে স্পষ্টতর হ'তে

লাগল—তখনও হিন্দুর গৌরবের দিন গত হয় নি। তারি একদিন —আজ মনে পড়ে—আসমুদ্র হিমাচল ভারতের নরনারী একপ্রাণে অশোকের ছত্র-পতাকা-তলে সমবেত হয়েছিল। সে দিন দিকে দিকে ভারতের বাণী বহন করে' লোক ছুটল। উত্তুঙ্গ ভূধর তাদের গতি রোধ করতে পারল না। অকূল পারাবারের উত্তাল তরঙ্গমালা তাদের পথ করে' দিলে। অমৃতের সন্ধান পেয়ে সে দিনের হিন্দুরা সে-অমৃত নিয়ে বিশ্ববাসীর দ্বারে দ্বারে ফিরল।

* * * *

তারপর তেমনি আর একদিন উজ্জয়িনীর কনক-পুরীতে জগন্মাতা হিন্দুর সভ্যতার যে এক অভ্রভেদী মন্দির গড়ে' তুলে-ছিলেন—ঐশ্বর্য্য গৌরব, জ্ঞান, শক্তি দিয়ে ভরে' তুলেছিলেন—সে কাহিনী আজও হিন্দুর মনে সহস্র নৈরাশ্যের অন্ধকারের মাঝে স্বর্ণরেখার মতো উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। আজ আমি মানস-নয়নে দেখতে পাই—সেই সুবর্ণপুরী উজ্জয়িনী—সেই উজ্জয়িনীর পথে পথে নরনারী কলহাস্যে গতিলাস্যে নির্ভীক উন্নতশিরে বিচরণ করছে—পথ-পাশে পাশে সহস্র বিপণিতে পণ্যরাজির আর অন্ত নেই—সে দিন বাতাসে বাতাসে ক্ষুব্ধ হাহাকারের পরিবর্ত্তে আনন্দোচ্ছ্বসিত কলহাস্য—আকাশে আকাশে খিন্ন দীর্ঘশ্বাসের পরিবর্ত্তে তৃপ্তির সুবাসিত হিল্লোল—মানুষের অন্তরে অন্তরে মৃত্যুর পরিবর্ত্তে, অনন্ত দুরাশা, দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবার শক্তি। মানস-নয়নে আমি দেখতে পাই—সে দিন উজ্জয়িনীর অসংখ্য চতুষ্পাঠীতে কত কত দিক দেশ হ'তে কত নরনারী এসে জগন্মাতার চরণে শিষ্য

বেশে তাঁর অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে দু'একখানি রত্ন নিয়ে আপনাকে ধন্য মনে করছে—নগর নগরীতে সে দিন উৎসবের আর শেষ নেই—পল্লীতে পল্লীতে শিশুদের কলরবের আর শ্রান্তি নেই—শস্য-শ্যামল সহস্র পল্লীর পাশে পাশে অগণ্য নদীতে নদীতে কল কল ছল ছল হাস্যের আর বিরতি নেই। স্বর্ণ-সিংহাসনে হিন্দু সম্রাট স্বর্ণ ছত্রতলে স্বর্ণ দণ্ড করে, দুষ্টের শাসন ও শিষ্টের পালন করছেন—রাজসভা হিন্দুর জ্ঞানে শক্তিতে শ্রদ্ধায় প্রীতিতে অলঙ্কৃত—রাজভাণ্ডার মুক্তহস্ত—ধরিত্রীর এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত দেবতার আশীর্ব্বাদে সমুজ্জ্বল। সে দিনের ছবি আমি মানস-নয়নে দেখি আর কোথা হতে দুই বিন্দু অশ্রুজলে আমার আঁখিপাত সিক্ত হ'য়ে ওঠে।

* * * *

তারপর আরও একদিন—শুধু একাদন কেন!—আরও কত দিন—কত বর্ষ—কত শতাব্দী—এই জগন্মাতার বুকে হিন্দু জ্ঞানে ঐশ্বর্য্যে, শক্তিতে, ভক্তিতে, কর্ম্মে, ভোগে আপনাকে সার্থক করে তুলেছিল। সেই অতীতকালে তরঙ্গোচ্ছ্বসিত অকূল পারাবারের বুকে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মতো শুভ্র পাল তুলে হিন্দুর অর্ণবতরণী কত কত পণ্য-সম্ভার জ্ঞান-সম্ভার নিয়ে দিগন্তের পরপারে কত কত দেশে ছুটল—কত কত দেশ হ'তে অর্ণবযান সপ্তসিন্ধু পার হয়ে, কত কত ঐশ্বর্য্য সম্পদ—কত কত ভক্তি প্রীতি নিয়ে হিন্দুর বন্দরে বন্দরে এসে লাগ্‌ল। কত যুগ ধরে' হিন্দু এক হাতে শক্তি আরেক হাতে প্রেম—একদিকে কর্ম্ম আর একদিকে জ্ঞান—একদিকে

ঐশ্বর্য্য আর একদিকে মুক্তি নিয়ে, আপনাকে জান্‌ল ও বিশ্ব-বাসীকে জানাল। তারপর ধীরে ধীরে হিন্দুর লীলার দিন ফুরিয়ে এল। জগন্মাতার দ্বিতীয় আহ্বান কোন্ এক নবীন জাতির অন্তরে গিয়ে বাজ্‌ল।

* * * *

হিন্দুকুশের পরপারে একি গুঞ্জন-ধ্বনি আজ শুনি! যবনিকার অন্তরাল হ'তে কত লক্ষ লোকের উৎসাহ-কলরব—প্রাণের হুঙ্কার আজ হিমাদ্রির বিরাট পঞ্জর ভেদ করে', মৃদু গুঞ্জনের মতো এ-পারের আকাশ বাতাসকে চঞ্চল কর্‌ল। কান পাত—ঐ কি শোনা যায়—প্রবল কোলাহলের মধ্য হতে মাঝে মাঝে প্রবলতর হুঙ্কারে ধ্বনিত হচ্ছে—"লায় লা হায় লাল্লা মহম্মদ রসুলাল্লা"! গহন তিমিরাবৃত নিশীথের বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গ সংক্ষুব্ধ সিন্ধুর উর্ম্মি-মালার মতো কোন্ নবীন জাতি আজ অদম্য প্রাণের বেগে আপ-নাকে আর আপনার মধ্যে ধরে' রাখ্‌তে পার্‌ছে না। তাকে বেরুতে হবে—বেরুতে হবে আজ আকুল স্রোতস্বিনীর মতো—হিমাদ্রির বক্ষ বিদীর্ণ করে'—কানন কান্তার, পল্লী, নগরী, মরু, গিরি ভাসিয়ে নিয়ে—আপনারই প্রাণের বেগে—গতির আনন্দে—আনন্দের আতিশয্যে। ধীরে ধীরে গুঞ্জন-ধ্বনি স্পষ্ট হ'তে স্পষ্টতর হ'ল—আরও স্পষ্ট—আরও স্পষ্ট—তারপর একদিন হিমাদ্রির বিরাট পঞ্জর ভেদ করে'—অর্দ্ধচন্দ্র আঁকা বিজয় বৈজয়ন্তী পতাকা উড়িয়ে—উন্মুক্ত-কৃপাণ লক্ষ লোক—জগত-পিতার নাম হুঙ্কার কর্‌তে কর্‌তে সিন্ধুর তীরে তীরে শার্দ্দূলের মতো দেখা দিল। কৃপাণে কৃপাণে

সংঘাত হ'ল—শূলে শূলে সংঘর্ষ হ'ল—অশ্ব-খুরোত্থিত ধূলিতে মেদিনী আচ্ছন্ন হ'ল—বিজয়ীর বিজয় হুঙ্কারে বিজিতের নিরাশা-চিৎকারে আকাশ বাতাস প্রপীড়িত হ'ল। মানব-শোণিতে ধরণী রঞ্জিত!—নদনদীর লোহিতাক্ত কলেবরে—হিন্দুর গৌরব-সূর্য্য ধীরে ধীরে অস্তমিত। মানব-সভ্যতার দ্বিতীয় পুরোহিত ক্ষত্রিয় বেশে জগন্মাতার বুকে বিশ্বমানবের মহালীলা প্রাঙ্গনে প্রবেশ করল।

*　　　*　　　*　　　*

তারপর সপ্ত শতাব্দী ধরে' এই দুই মহাজাতি বিরোধে মিলনে, শান্তিতে সংগ্রামে, ভয়ে ভক্তিতে পরস্পর পরস্পরের কাছে আপনাকে পরিচিত করতে করতে চল্‌ল—পরস্পর পরস্পরকে জয় করতে করতে চল্‌ল। তাই এই সপ্ত শতাব্দী ধরে' কখনও মহাকালীর তাণ্ডবনৃত্যে দিগ দিগন্তে বজ্রশিখা ছড়িয়ে গেল—মেদিনী কম্পমান হ'ল—দেবালয় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ধূলিতে মিশিয়ে গেল—মানবরুধিরে বসুন্ধরা রঞ্জিত হ'ল;—আবার কখনও বরাভয়করা জগতজননীর প্রশান্ত হাস্যে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে বনে বনে ফুল ফুট্‌ল—বিহঙ্গ কাকলীতে কাননভূমি মুখরিত হ'ল—দিগন্তপ্রসারী শ্যামাঙ্গিনীর বুকে বুকে শ্যামশস্য আপনার মায়া বিছিয়ে দিল—শান্তির প্রলেপে যত ব্যথা সব মুছে গেল। ধীরে ধীরে মন্দিরের পাশে পাশে মসজিদ্‌ নির্ম্মিত হ'ল—হিন্দুর অন্তরে অন্তরে মুসলমান ফকিরের জন্য আসন পাতা হ'ল। ধীরে ধীরে এই দুই মহাজাতি—হিন্দু মুসলমান—পরস্পর পরস্পরকে চিন্‌ল। বুঝ্‌ল তারা যে এমন একটা স্থান আছে যেখানে তাদের বিরাট ঐক্য—বুঝ্‌ল তারা যে সর্ব্ব প্রথমে তারা

মানুষ—আর মানুষ মানুষের কাছে যা চায় সেটা সংগ্রামের মধ্যে নেই—অবজ্ঞার মধ্যে নেই—বিচ্ছেদের মধ্যে নেই, আছে সেটা প্রীতির মধ্যে—মিলনের মধ্যে—শান্তির মধ্যে, মানুষের বিরোধ সে দু'দিনের—মানুষের প্রেম সে অনন্ত। যারা একদিন উদ্ধত-হৃদয়ে উন্মুক্ত কৃপাণ নিয়ে জয় করতে এলো তারা ধীরে ধীরে পরাজয় মান্‌ল—যারা একদিন শত্রুর বেশে জগন্মাতার বুকে তাণ্ডব-নৃত্য করলে তাদেরকে আর একদিন অনন্তস্নেহে অভিষিক্ত করে' জগন্মাতা আপনার সন্তান করে' নিলেন।

*　　　*　　　*　　　*

সহসা আজ সিন্ধুর কল কল ছল ছল দ্বিগুণতর হ'য়ে উঠ্‌ল কেন! সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে হিন্দু মুসলমান বিস্মিত হ'য়ে দেখ্‌ল পশ্চিম-দিকচক্রবালে পারাবার-বুক তরণীতে তরণীতে ছেয়ে গেছে। পালে পালে প্রভঞ্জনের হাওয়া, তাদের ক্ষুধার্ত শ্যেন পক্ষীর মতো সাঁ সাঁ করে' ছুটিয়ে চলেছে—হিমাদ্রিসমান তরঙ্গের বক্ষ বিদীর্ণ করে' করে'—শুভ্র ফেন-পুঞ্জে-পুঞ্জে বারিধি-হৃদয় আচ্ছাদিত করে' করে' ছুটে আসছে সহস্র তরণী তাদেরি পানে। ধীরে ধীরে কখন গোধূলি আপনার স্বর্ণাঞ্চলখানি টেনে নিয়ে দূর দিগন্তের গায়ে মিশিয়ে গেল—ধীরে ধীরে সন্ধ্যারাণী এসে দিবসের শেষরশ্মি রেখা-টুকু আপনার অসিত অঞ্চলে মুছে নিলেন—তখন সেই আধআলো আধঅন্ধকারের মাঝে সহস্র তরণী এসে তটে লাগ্‌ল। হিন্দু-মুসলমান বিস্মিত হ'য়ে দেখ্‌ল সেই সহস্র তরণীতে এক নবীন মনুষ্য—শ্বেতবর্ণ—নীলচক্ষু—পিঙ্গলকেশ। কৌতূহলোদ্দীপ্ত তারা

জিজ্ঞেস করল—"তোমরা কে ?"

"আমরা বণিক।"

"তোমাদের পণ্য সম্ভার কি ?"

"পণ্য আমাদের নূতন প্রাণের নবীন উৎসাহ—তরুণ হৃদয়ের অনন্ত দুর্নিবার আশা আকাঙ্খা—তপ্ত রক্তস্রোত-প্রবাহিত ধমনীর দুরন্ত কর্ম্ম-পিপাসা—ধরিত্রীর সন্তান আমরা—সপ্তসিন্ধুর মানস-পুত্র আমরা।"

হিন্দু মুসলমান বললে—"তোমাদের পণ্য আমরা জানি না। তা'তে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। তবে এ জগন্মাতার দেশ—সবার অবারিত দ্বার। এসো—তোমারও স্থানের অভাব হবে না।" বিদেশী বণিক তার পণ্য সম্ভার নিয়ে কূলে অবতরণ করল। মানব-সভ্যতার তৃতীয় পুরোহিত বৈশ্যবেশে এ জগন্মাতার কূলে বিশ্ব-মানবের মহালীলা প্রাঙ্গনে প্রবেশ করল।

* * * *

তারপর যখন রজনী প্রভাত হল তখন সেই বিদেশী বণিকের একদল চমৎকৃত হ'য়ে দেখ্‌চে যে তাদের অজ্ঞাতসারে—কখন তাদের লোহার তুলাদণ্ড সোনার রাজদণ্ডে পরিণত হয়েছে।

* * * *

এখন এই যে তিন মহাজাতি—এই যে হিন্দু মুসলমান ক্রিশ্চিয়ান—এই যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য—এই তিন মহাজাতিকে মন্থন করে' কত হলাহলের পর কবে কোন্ অমৃত উঠ্‌বে তা কে জানে ? তবে অমৃত যে একদিন উঠ্‌বেই সে-বিষয়ে কোন সংশয় নেই।

"বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়"

যখন মায়াবাদের সঙ্গে সঙ্গে "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" ইত্যাদি সূত্রে দেশের আকাশটা ছেয়ে গিয়েছিল, যখন শতাব্দী শতাব্দীর ত্যাগমন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে মনে দৃঢ় ধারণা হ'য়ে গিয়েছিল যে অমৃতের পথটা কৃচ্ছ্রতা সাধনের ভিতর দিয়েই আছে, যখন সমস্ত হিন্দুর প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে এই জগতটা একটা বিরাট অন্ধকার দিয়ে গড়া—এখানে আছে শুধু দুঃখ আর পাপ—আছে শুধু অশ্রু আর শোক—আছে শুধু দারিদ্র্য আর অপমান, তখন বাঙালীর কানে কানে বাঙালীর কবি নির্ভীক হৃদয়ে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা কর্‌লেন

> বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
> অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
> লভিব মুক্তির স্বাদ।

এ এক অপূর্ব্ব ব্যাপার—এ এক অতীতের বিরুদ্ধে জাজ্বল্যমান সংগ্রাম—ত্যাগের বিরুদ্ধে স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ্‌। বাঙালী সে দিন তার চিন্তার পুরাতন ও সনাতন পথে থমকে দাঁড়িয়ে গেল, মনে মনে আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লে—একি শুনি!

বালক রবীন্দ্রনাথ যেদিন "প্রকৃতির প্রতিশোধ" লিখেছিলেন, সেদিন সেটাকে আমরা বালকের খেয়াল বলেই উড়িয়ে দিয়েছিলেম। যুবক রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর "কড়ি ও কোমলে" লিখ্‌লেন

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই,

তখন সেটাকে আমরা প্রদীপ্ত যৌবনের অতিশয়তার মাঝে একটা ব্যক্তিগত কাল্পনিক অতিশয়োক্তি বলেই উপেক্ষা করেছিলাম। কিন্তু প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর "নৈবেদ্যে"র থালিতে

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

এই মালাটি সাজিয়ে দিলেন—তখন তার মধ্যে এমন একটা জিনিস দেখ্‌তে পেলেম, যেটাকে বালকের খেয়ালও বল্‌তে পারি নে, কিম্বা কল্পনা-রঙিন্ যৌবন-বসন্তের আকাঙ্ক্ষা-কল্লোলের একটি তরঙ্গ-হিল্লোলও বল্‌তে পারি নে। তার মধ্যে এমন একটা অ-ব্যক্তিত্বের বা সর্ব্ব-ব্যক্তিত্বের কথা শুনলেম যে সেটাকে আর ব্যক্তিগত রবীন্দ্র-নাথের কথা বলে' মান্‌তে পারলেম না। এ যেন মানুষের অন্তরের কথা—যে মানুষ লক্ষ লক্ষ যুগ কাটিয়ে এসেছে—এ যেন আমার কথা, তোমার কথা, সবারই কথা, এ যেন বিশ্ব-মানবের আসল কথাটি—তার সত্য ধর্ম্ম। সেদিন থেকে বাঙালীর মনের সাম্‌নে একটা নতুন চিন্তার পথ খুলে গেল।

কত শতাব্দী ধরে' হিন্দুর জীবন-দেবতার মন্দিরে যে বিরাট তমসারূপী অপ্রবৃত্তিরূপ মহা-অসুর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, সে মহা-অসুরের যাদুমন্ত্রে ভগবানের এই বিরাট সৃষ্টির লীলার মন্দির তার কাছে বেদনাময় হ'য়ে উঠেছিল—বিভীষিকাপূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল। মানুষের ঘোর অধর্ম্ম এই অপ্রবৃত্তি—এই অপ্রবৃত্তিকে মানুষের অন্তর থেকে দূর করতে হবে, নইলে মানুষ কোনদিন আপনাকে সার্থক করে' তুলতে পারবে না। এই অপ্রবৃত্তিই হচ্ছে বৈরাগ্যের প্রতিষ্ঠাভূমি। বৈরাগ্যের ভিতরে মানুষ কোন দিনই আপনার জীবনের অর্থ খুঁজে পাবে না।

মানুষের অন্তরে অন্তরে যে চিন্ময়ীদেবী আসন পেতে বসে' আছেন, সে চিন্ময়ীদেবীর আসন থেকে মানুষের মনে প্রাণে যে আদেশ আসছে সে ত বৈরাগ্যের নয়, ত্যাগের নয়, বর্জ্জনের নয়—সে যে গ্রহণের, আলিঙ্গনের। মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোমের, এ পৃথিবীর প্রত্যেক ধূলিকণাটির যে সম্বন্ধ সে সম্বন্ধ ত শত্রুর সম্বন্ধ নয়, সে সম্বন্ধ যে মিত্রের—সে সম্বন্ধ দ্বেষের নয়, প্রেমের। প্রেম যেখানে, আনন্দও সেখানে। তাই ত মানুষ নিশিদিন ছুটছে যতদিক দিয়ে সম্ভব ততদিক দিয়ে আপনাকে এই ধরিত্রীর সঙ্গে মিলিত করবার জন্যে। তাই ত তার এই অন্তরের প্রেম আনন্দ হাজার দিক দিয়ে হাজার রূপ নিয়ে ফুটে উঠছে; তাই ত তার ধন জন মান ঐশ্বর্য্য সম্পদ গৌরবকে আলিঙ্গন, আনন্দের পুলকে সে আপনাকে সহস্র খানে বেঁটে দিচ্ছে। কিন্তু ঐ অপ্রবৃত্তিকে আশ্রয় করে' আমরা এই প্রেমকে

হারিয়েছিলেম—সুতরাং এ জগতে আমরা আনন্দকেও পাই নি। তাই বৈরাগ্যকেই চরমপথ মনে করে' নির্ব্বাণকেই আমরা পরম মোক্ষ বলে' মেনে নিয়েছিলেম।

কিন্তু মিথ্যা যা, তা কতকাল টিক্‌বে? অনৃতের ওপরে ভিত্তি করে' যে মন্দির—সে-মন্দির যত বিরাটই হোক না কেন—যত উঁচুতেই তা আকাশে মাথা তুলুক না কেন—সত্য একদিন তাকে নত করবেই। কেননা সত্যের মৃত্যু নেই—কিন্তু অনৃতের ক্ষয় আছে। তাই সুদীর্ঘকাল পরে কত-শতাব্দী-সঞ্চিত অনৃতের বিরাট স্তূপ ভেদ করে' হিন্দু কবির অন্তরে ঐ পরম সত্য ফুটে উঠ্‌ল "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়"! কার সত্য এ? কিসের সত্য এ? এ সত্য মানুষের—মানুষের শিরায় শিরায় যে প্রাণের স্পন্দন প্রতিমুহূর্ত্তে কম্পিত হচ্ছে এ সত্য সেই প্রাণের স্পন্দনের—মানুষের অন্তরে তার অন্তর-দেবতা নিশিদিন যে আনন্দ বিতরণ করছেন এ সত্য সেই আনন্দের। এ সত্যকে যে-মানুষ উপেক্ষা করবে এ জগতে তার মঙ্গল নেই। কেননা, সত্যের মধ্যেই মঙ্গল রয়েছে—অন্যত্র নয়।

সেই সুদূর অতীতের আদিম ঊষায় যেদিন মানব-শিশু আঁখি মেলে প্রথম চেয়ে দেখেছিল, সে দিন ত তার মাথার ওপরে আকাশে আকাশে পায়ের নীচে ধরিত্রীর ধূলিতে ধূলিতে কোন অমঙ্গলের ছায়া সে দেখ্‌তে পায় নি—সে দিন ত তার মন প্রাণ বেদনায় বেদনায় ভরে' ওঠে নি। সে-দিন যে বিস্ময়ে বিস্ময়ে তার আঁখিপাত বিস্ফারিত হয়েছিল—কৌতূহলে কৌতূহলে তার অন্তর ছেয়ে

গিয়েছিল—পুলকে পুলকে তার চিত্ত মন প্রাণ ভরে' উঠেছিল। অবোধ সে, কিছুই জানত না সেদিন; কিন্তু কেমন করে' তার অস্পষ্ট অস্পষ্ট মনে হয়েছিল যে, এই যে ধরিত্রী—এই যে শব্দ গন্ধ রূপ রস—এ মিথ্যা নয়, ব্যর্থ নয়, অমঙ্গলময় নয়—এ সত্য-আনন্দ-ময়; আর তার প্রমাণ ছিল তার অন্তরে। এ তারই জীবনের অর্ঘে অর্ঘে পূর্ণ, তার শিরায় শিরায় যে ওজস রয়েছে, মনে মনে যে আশা আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, প্রাণে প্রাণে যে দুর্ব্বার কর্ম্মপ্রেরণা রয়েছে,—এ তারই সুরে সুরে সুরবাঁধা—তাকেই সার্থক করে' তোল্‌বার জন্যে এই সৃষ্টি। তাই সেদিন বৈরাগ্যের কথা তার মনেও ওঠে নি। এই শব্দ-গন্ধ-রূপ-রস-পুলকিত ধরিত্রীতেই যে মানুষের সকল সত্য আপনার সার্থকতা পাবে। আর সেই ত মানুষের পরম মুক্তি—তার সকল সত্যের সার্থকতা।

কিন্তু মানুষের সম্বন্ধে এই যে চরম সত্য—এই চরম সত্যকে আমরা কত শতাব্দী ধরে' মিথ্যা বলে' মেনেছিলেম। এই মিথ্যা আমাদের পরলোকে নির্ব্বাণ পাইয়ে দিয়েছে কি না জানি না, কিন্তু ইহলোকে তা আমাদের কোন আনন্দ-লোকে নিয়ে যায় নি। এই মিথ্যার আশ্রয়ে আজ আমাদের জীবনে যা কিছু সব হয়ে উঠেছে বন্ধন। কারণ সত্যের উদ্‌যাপনেই মুক্তি—মিথ্যার আলিঙ্গনেই বন্ধন।

এই মিথ্যাকে আলিঙ্গন করে' মানুষ আপনার মনুষ্যত্বকে খুঁজে পায় নি, আপনার আত্মাকে খুঁজে পায় নি—তাই আজ সে দীন, অক্ষম, শক্তিহীন। তাই আজ দেশের আকাশে বাতাসে যে সুর উঠ্‌ছে সে সুর মানুষের মানবজন্মের জয়োল্লাসের সুর নয়, দেশ-

বাসীর মনপ্রাণ আজ মানুষের মহত্ত্ব-গৌরব দিয়ে ভরে' যায় নি। আজ চারিদিকে তাই বিরাট ক্রন্দন, খিন্ন দীর্ঘশ্বাস, অসহায়ের অক্ষমতা। এ ত মুক্তি নয়, মোক্ষ নয়। এ যে মানুষের মনুষ্যত্বের চরম দুর্দ্দশা, তার মানুষ নামের দুরপনেয় কলঙ্ক।

এই মিথ্যার পথ, অনৃতের পথ—মানুষের এই অকল্যাণের পথ যাঁরা মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা এ জগৎকে গ্রাহ্য করেন নি—তাই তাঁদের বংশধরেরা আজ জগতের অগ্রাহ্য। এই সৃষ্টির সত্যকে—এই জগতের সত্যকে—মানুষের সত্যকে যাঁরা সম্মান করেন নি, তাঁদের বংশধরদের আজ জগতব্যাপী অসম্মানের অন্ত নেই।

কিন্তু কবির বাণী আজ আমাদের অন্তরের নিভৃততম প্রদেশের নিগূঢ়তম সত্যটিকে আঘাত করে' আমাদের চোখে একটা নতুন দৃষ্টি এনে দিয়েছে। এই দৃষ্টিতে আজ আমরা এ জগৎকে অন্ধকারময় করে' দেখ্‌ছি না। যেমন প্রতি উষায় সহস্র ফুল গালভরা হাসি নিয়ে ফুটে ওঠে—প্রতি নিশায় লক্ষ তারা কোন্ নিবিড় রহস্যের রসধারা পান করে চোখ মেলে জেগে ওঠে—তেমনি মানুষের জীবন-কমল এই শব্দ-গন্ধ-রূপ-রস-ময়ী ধরিত্রীর মাটি থেকে আনন্দরস আহরণ করে' ফুটে উঠে কোন্ অজ্ঞাত অতি-অন্তরতম চিররহস্যের পানে তার আশা আকাঙ্ক্ষার সহস্র দলরাজি মেলে দিচ্ছে। আমরা আজ মানুষকে দু'দিক থেকেই জান্‌তে চাই—আর সেই ত মানুষকে সত্য করে' জানা, নিঃশেষ করে' জানা। এক দিক তার সান্তের দিক—আর এক দিক তার অনন্তের দিক; এক দিক তার লীলার দিক

—আর এক দিক তার সমাধির দিক ; এক দিকে সে চিরমুখর—আর একদিকে সে অনন্ত মৌনী ; এক দিকে তার এই শস্যশ্যামলা ধরিত্রীর অগাধ স্নেহ—আর এক দিকে তার নিবিড় নীল আকাশের বিরাট আকর্ষণ।

আজ আমরা দেশকে তুল্‌তে চাচ্ছি, নেশান গঠন কর্‌তে যাচ্ছি, যশহীন গৌরবহীন ঐশ্বর্য্যহীন এই হতভাগ্য দেশকে ঐশ্বর্য্যে সম্পদে গৌরবে আবার প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে যাচ্ছি, কিন্তু সে প্রয়াসকে সফল করে' তুল্‌তে চাইলে আগে সে প্রয়াসকে সত্য করে' তুলতে হবে। আর সে প্রয়াসকে সত্য করে' তুল্‌তে চাইলে দেশবাসীর সম্মুখ থেকে বৈরাগ্যের আদর্শকে অপসারিত করে' তার অন্তরে এই শস্য-শ্যামলা ধরিত্রীর প্রেমকে জাগ্রত করে' তুল্‌তে হবে। যদি মানুষের জীবনের প্রতি আমাদের প্রেম না জন্মে তবে ইহলোকে আমরা অমৃত আদায় কর্‌তে—আনন্দ আদায় কর্‌তে কিছুতেই পার্‌ব না। কেননা, যেখানে প্রেম, সেইখানেই শুধু আনন্দ। আর যেখানে আমাদের আনন্দ নেই, সেখানে কোন অনুষ্ঠানকেই আমরা সফলতা দান করতে পার্‌ব না। আনন্দহীন কর্ম্ম মানুষের বোঝা। এই বোঝার নীচে আমাদের খাটা হবে বেগার খাটা। যে-কোন বোঝা মানুষের অক্ষমতাই বাড়িয়ে তোলে—তাকে মহৎও করে' তোলে না, বৃহৎও করে' তোলে না।

অতি সহজ, অতি স্বাভাবিক যে বেঁচে থাকার আনন্দ, মানুষের জীবনে যখন সেই বেঁচে থাকার আনন্দটাই লুপ্ত হ'য়ে যায় তখন তার বেঁচে থাকাটা হ'য়ে ওঠে বোঝা। তখন সে এই জগতের কর্ম্মে

ভোগে যশে গৌরবে কোনই সার্থকতা দেখ্‌তে পায় না—কারণ সার্থকতা ত মানুষের বাহিরের বস্তু বা বিষয়সমষ্টির মধ্যে নেই—আছে তা তার আপনার অন্তরে—আপনার অন্তরের সত্যে—তার অন্তরের সত্যের আনন্দে। এই বোঝার নীচে থেকে তখন সে মানুষের জীবনকে অভিশাপই দিতে থাকে, তখন সে সূক্ষ্ম দর্শনের সূক্ষ্মতর তর্কজাল বিস্তার করে' প্রমাণ কর্‌তে চায় যে সৃষ্টির কোন অস্তিত্বই নেই—এই জগৎ একটা বিরাট মিথ্যা—মানুষের জীবন একটা অর্থহীন মায়া। তার কাছে মানুষের জীবন অর্থহীনই বটে, কারণ জীবনের ত আর কোন অর্থ নেই—শুধু এক অর্থ ছাড়া—সে হচ্ছে, মানুষের জীবন-দেবতার আনন্দের অনন্তরূপে প্রকাশ—সহস্র সুরে, সহস্র রঙ্গে, সহস্র ভঙ্গীতে তার অনন্ত রূপকে আলিঙ্গন। কিন্তু নির্ব্বাণকামী দার্শনিকের যে এই আনন্দেরই অভাব।

কত হাজার বর্ষ ধরে' এই ধরিত্রীর বুকে বিচরণ করে'—এই ধরিত্রীর সম্পদে বিপদে যশে গৌরবে দুঃখে সুখে আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে দিয়ে হিন্দুর জাতীয়-জীবনে একটা অবসাদের যুগ, আলস্যের যুগ, একটা ঔদাসীন্যের যুগ এসেছিল। হিন্দুর কর্ম্মেন্দ্রিয় ভোগেন্দ্রিয় অক্ষম হ'য়ে পড়্‌লেও, তার খুসী হবার ক্ষমতা সুপ্ত হ'য়ে পড়্‌লেও, তার চিন্তাশক্তির ধারা সেদিনও মলিন হয়নি। তাই সেদিন সে আপনার অন্তরের সেই অবসাদকে সত্য ভ্রমে আশ্রয় করে'—তার জীবন-দেবতার ঔদাসীন্যকে মহত্ত্বে মণ্ডিত করে' এ জগতের নশ্বরতামূলক নির্ব্বাণ-তত্ত্বমূলক এক বিরাট দর্শন গড়ে' তুল্‌ল। সমাজে শক্তিমান যাঁরা, ধীমান যাঁরা, তাঁরা যখন সংসারের অনিত্যতা

প্রচার কর্‌তে লাগ্‌লেন, নির্ব্বাণমুক্তি-তত্ত্বের জয় ঘোষণা কর্‌তে লাগ্‌লেন, তখন সমাজের অশক্ত যাঁরা সাধারণ যাঁরা তাঁরা অবনত মস্তকে তাঁদের সে উপদেশ শিরোধার্য্য করে' তাঁদের জীবনকে সেই অনুসারে নিয়ন্ত্রিত কর্‌তে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু সত্যকে ধ্বংস কর্‌বে কে? তাই আজও হিন্দু বেঁচে আছে, তার সমাজ সংসার দেশ জাতি মান অভিমান সব নিয়ে শুধু আজ সে অশক্ত—আজ তার জীবনে বৃহতের পরিবর্ত্তে বেদনাময় সংকীর্ণতা, মহতের পরিবর্ত্তে তার বেঁচে থাক্‌বার প্রতিদিনের ক্ষুদ্র আয়োজন, মুক্তির পরিবর্ত্তে তার ভিতরে বাহিরে সহস্র বন্ধন। এ-ই যে তার জীবনে "প্রকৃতির প্রতিশোধ"। অজ্ঞানে আমরা অনৃতকে বরণ করেছিলেম, তাই আমাদের ঘরে-বাইরে আজ অমঙ্গলের ইয়ত্তা নেই।

কিন্তু আজ বাঙালীর জীবন-দেবতার মন্দিরে সেই অবসাদের যুগ অবসানপ্রায়। নইলে "নির্ঝরিণীর স্বপ্নভঙ্গ" হ'ত না, "অচলায়তনে"র শঙ্কাহীন শান্তিময় জীবনের মাঝে পঞ্চক হাঁপিয়ে উঠ্‌ত না, নইলে আজ "ফাল্গুনী"র বাঁশী এমন করে' বেজে উঠ্‌ত না। হিন্দুর অন্তরে আবার মানুষের সত্য ধীরে ধীরে আপনাকে জাগ্রত করে' তুল্‌ছে। সেদিন অজ্ঞানে আমরা অনৃতকে বরণ করে নিয়েছিলেম—আজ যেন সজ্ঞানে আমরা সত্যকে অভিনন্দিত কর্‌তে পারি।

২

অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

যখন মানুষ অখণ্ডকে খণ্ডের মধ্যে দেখ্‌তে পায় পূর্ণকে অপূর্ণের মাঝে ধরতে পায়, তখন জ্যামিতির নিয়ম-কানুনগুলো ধীরে ধীরে তার মনে মিলিয়ে আস্‌তে থাকে। তখন আর বন্ধন ও মুক্তিকে তার পরস্পরবিরোধী বলে' মনে হয় না। বন্ধন—সে যে তার অপূর্ণতার দিক; মুক্তি—সে যে তার পূর্ণতার দিক। এ যে 'সীমার মাঝে অসীম সে যে বাজায় আপন সুর'। এই বন্ধনের সঙ্গে মুক্তিকে—সীমার সঙ্গে অসীমকে যুক্ত করে' রেখেছে এক অনির্ব্বচনীয় অবিনশ্বর মহানন্দময় সত্তা। তাই এই সৃষ্টি—তাই এই মানুষ।

কিন্তু মানুষ যখন আপনাকেই একান্ত করে' দেখে—এই বিরাট ও বিচিত্র সৃষ্টির মাঝ থেকে আপনার অস্তিত্বকে বিচ্ছিন্ন করে' দেখে, তখন সে ঐ অবিনশ্বর মহানন্দময় সত্তাকেও হারায়—তখনই তার বন্ধন হ'য়ে ওঠে একান্তই বন্ধন। কারণ তখন সে তার বন্ধনের মাঝে যে বন্ধনের অতিরিক্ত একটা কিছু আছে—সেই "অতিরিক্ত"টাকে দেখ্‌তে পায় না। এই অতিরিক্তটাকে দেখ্‌বার অভাবই হচ্ছে বৈরাগ্যের মূলভিত্তি।

কিন্তু মানুষ ত একটা খাপছাড়া বস্তু বা বিষয় নয়—এই বিচিত্র লীলার মাঝে একটা একান্ত অর্থহীন বিচ্ছেদ নয়। সে যে এই

সৃষ্টির অনন্তরূপেরই একটা রূপ—অনন্ত নামেরই একটা নাম। এই অনন্তরূপকে বিনিসুতোয় গাঁথা মালার মত করে' রয়েছে এক পরম অরূপ—এই অনন্ত নামের বিচ্ছেদকে অবিভক্ত করে' রেখেছে এক চরম নামাতীত; প্রত্যেক মানুষ সেই পরম অরূপেরই একটি রূপময় বিগ্রহ—সেই নামাতীতেরই একটা বিশিষ্ট নাম। এই নিবিড় বোধ যখন মানুষের প্রাণে প্রাণে স্বচ্ছন্দ হ'য়ে ওঠে তখন স্বতঃই তার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে—

স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্ত্তে থাক দুঃখে সুখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা—অশ্রুজলে চির শ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি!

কারণ তখন দুঃখ তার দুঃখ নয়—কষ্ট তার কষ্ট নয়; প্রতি-মুহূর্ত্তে সে তখন দুঃখকষ্টকে অতিক্রম করে' আনন্দলোকের সংবাদ পাচ্ছে; তখন বেদনা তার বেদনা নয়—ব্যর্থতা তার বন্ধন নয়—সকল বেদনা সকল ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে সে তখন সেই অমৃত-লোকেরই আহ্বান শুনছে। তখন বন্ধন তার মুক্তি—বন্ধনেই তার মুক্তি। কারণ বন্ধনই যে তার জীবনের সেই পরমলীলাময়ের সত্য। আর সত্যকে স্বীকার করে' যে মুক্তি সেই মুক্তিই আসল মুক্তি—সত্যকে অস্বীকার করে' যে মুক্তি সে মুক্তি প্রকৃতপক্ষে বন্ধন। মানুষ যখন তার জীবনের, তার প্রকৃতির এই আনন্দময় সত্যের সাক্ষাৎ লাভ করে তখন তার সহস্র বন্ধনের ভিতর দিয়ে, সহস্র-বন্ধনকে ছাপিয়ে ডুবিয়ে প্রবহমান হয় সেই অবিনশ্বর অমৃতধারা।

আর তখনই সে প্রকৃত জীবন্মুক্ত—তখন সে অধিকারী হয় এই মর্ত্ত্যধামেই স্বর্গভোগ কর্‌তে, তার কর্ম্মে ভোগে আহারে বিহারে প্রেমে প্রীতিতে যশে গৌরবে সেই পরমজনের মঙ্গলময় হস্ত দেখ্‌তে। মানুষের সমস্ত সত্যের মাঝে সে তখন দেখ্‌তে পায় আপনার জীবনের মুক্তি—পরম মুক্তি। পরম জ্ঞানে উদ্দীপ্ত হ'য়ে সেদিন তার কণ্ঠে আপনা-আপনি উচ্চারিত হয়—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
সহস্র বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

'অচলায়তন'

'অচলায়তন'খানি যেদিন ভূমিষ্ঠ হ'য়ে দশজনের চোখে পড়্‌ল সেদিন সে সঞ্চার করে গিয়েছিল—প্রবীণের মনে মনে বিরাগ আর নবীনের বুকে বুকে পুলক। এর অবশ্য কারণও ছিল। সেটা হচ্ছে এই যে এই, 'অচলায়তন'খানিতে প্রবীণদের আরামে আঘাত কর্‌বার একটা চেষ্টা আছে কিন্তু নবীনদের আনন্দে ব্যাঘাত ঘটাবার কোন ব্যবস্থা নেই। তবে অবশ্য এ কথাটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে সকল দেশেই সকল সময়েই প্রবীণদের মধ্যেও অনেক নবীন লুকিয়ে থাকেন আবার নবীনদের মধ্যেও অনেক প্রবীণ জন্ম নেন।

'অচলায়তন' রবীন্দ্রনাথের একখানি নাটক। কিন্তু আমরা নাটক বল্‌লে যা বুঝি—শেক্‌স্‌পীয়ার কালিদাস বল্‌লে যা বুঝি—এমন কি, মেটারলিঙ্ক্‌ ইব্‌সেন্‌ বল্‌লেও যা বুঝি এখানি ঠিক তা' নয়। প্রথমতঃ চোখে-পড়া এর বিশেষত্ব এই যে এতে কোন স্ত্রী-চরিত্র নেই আর দ্বিতীয়তঃ মনে-লাগা বিশেষত্ব এই যে এতে পুরুষেরও যে চরিত্রগুলো আছে তা মানুষের চরিত্র বল্‌লে সম্পূর্ণ ঠিক হবে না। সেগুলো যেন মানুষনামক ভগবানের যে সৃষ্ট জীবটী তারই বিভিন্ন

বিভিন্ন ভাব—এক একটা দেহ অবলম্বন করে' ফুটে উঠেছে। মানুষের 'চরিত্রে' আর 'ভাবে' প্রভেদ এই যে চরিত্রটা মানুষের বাহিরের কিন্তু ভাব জিনিসটা তার অন্তরের। মানুষের চরিত্র হচ্ছে সেইটে যেটা ফুটে ওঠে যখন সে অপরের সংস্পর্শে আসে, অপরের সঙ্গে ব্যবহার করে—কিন্তু ভাব তার ভিতরের বস্তু আপনার সত্তাতেই যার অস্তিত্ব। ইংরাজিতে বলা যেতে পারে যে প্রথমটা হচ্ছে মানুষের objective experience আর দ্বিতীয়টা subjective experience, সেই জন্তেই আমরা এই আচলায়তনের পুরুষগুলোকে মানুষের 'চরিত্র' বল্‌তে নারাজ—এরা যেন মানুষের বিভিন্ন বিভিন্ন 'ভাব'। পঞ্চক, মহাপঞ্চক, আচার্য্য অদীনপুণ্য, দর্ভকেরা, শোণপাংশুদল এরা যেন সবাই, মানুষের মর্ম্মতলে তার জীবন-দেবতা বসে' নিশিদিন যে বীণা বাজাচ্ছে, সেই বীণার এক-একটা সুর, বড় জোর এক একখানি গান—আর এদের কাছে যেটা বহির্জগৎ তারও অর্থ তাদের ওই নিজের নিজের গানের অর্থে। আর তাই পঞ্চকে মহাপঞ্চকে এত প্রভেদ—বিরোধ বল্‌লেও হয়। কিন্তু জীবন-দেবতা জানে যে এ প্রভেদ বিরোধ নয়—বরং ঠিক তার উল্টো। এরা মানুষের জীবনে পরস্পর পরস্পরকে সম্পূর্ণ করেই চলেছে। জীবন-দেবতা জানে সে কথা। এই জীবন-দেবতা হচ্ছে দাদাঠাকুর। আর তাই দাদাঠাকুর "একলা হাজার মানুষ" আবার "মজার মানুষ"ও বটে—তাই দাদাঠাকুর "কোণের মানুষ" আবার "সব মিলনে মেলার মানুষ"ও বটে। কারণ মানুষের জীবন-দেবতা অনন্ত গুণের দেবতা। সেখানে অনন্ত রঙের আলোতে

অনন্ত রাগিণী উঠ্‌ছে—বিরামহীন রাগের মূর্চ্ছনায় বিচিত্র বিচিত্র ছবি ফুট্‌ছে। ক্ষুদ্র, মহৎ, বন্ধন, মুক্তি, হাসি, অশ্রু, করুণ, রুদ্র—সব সত্য হ'য়ে রয়েছে সেখানে—আনন্দময় হ'য়ে রয়েছে সেখানে। তাই দাদাঠাকুর যখন অচলায়তনের দেয়াল ভেঙ্গে সেখানে নতুন করে' সবায় আবার প্রাচীর গড়্‌তে আদেশ করলেন তখন সেখান থেকে বাদ দিলেন না কাউকেও,—সেখানে সবাই রইল—পঞ্চকও মহাপঞ্চকও—যে দুজন চিরকাল অচলায়তনে পরস্পর পরস্পরের পথে বাধা হয়েই কাটিয়ে এসেছে।

২

এই বইখানিতে একটা বিষয় আছে যেটা সম্বন্ধে কারও ভুল কর্‌বার কোনই সম্ভাবনা নেই সেটা হচ্ছে এই যে—এর আসল লোক হচ্ছে পঞ্চক। এই পঞ্চক কে? অচলায়তনের সবাই যদি জীবন-দেবতার বীণার এক একটা সুর হয়—তবে তার মধ্যে প্রথম সুরটা—প্রধান সুরটা হচ্ছে পঞ্চক। পঞ্চকের ঐ সুর আছে বলে' আর সকল সুরেরও ফুটে ওঠা সম্ভব হয়েছে। পঞ্চকের ঐ সুর থামিয়ে দিলে আর সকল সুরও একে একে থেমে যাবে। এ সুর হচ্ছে মানুষের সেই অতি পুরাতন অতি সনাতন মুক্তির সুর—এ জগতে ছাড়া-পাওয়ার সুর।

সেই অতি পুরাতন অতি সনাতন মানুষ—যে মানুষ চায় প্রকাশ—চায় অনন্ত রাগিণীর মাঝে বিচিত্র আলোকের মাঝে ছন্দে

ছন্দে তালে তালে প্রতি পলে পলে ফুটে উঠ্‌তে,—আপনাকে এ বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে, বিলিয়ে দিতে। যেমন করে' গাছ আপনার ডালপালা ছড়িয়ে দেয়, যেমন করে' ফুলটী আপনার সৌরভ বিলিয়ে দেয়—তেমনি করে' ছড়িয়ে দিতে বিলিয়ে দিতে। কিন্তু কেন? কোন্ প্রয়োজন সাধনের জন্য? কোন প্রয়োজন সাধনের জন্য নয়। প্রয়োজন যদি কিছু থাকে তবে সেটা ভীষণ রকমের গৌণ। এ ছড়িয়ে দেওয়ার "কেন"র উত্তর হচ্ছে—আনন্দ। এই ছড়িয়ে দেওয়া, এই প্রকাশ হওয়াতে মানুষের আনন্দ আছে তাই—আবার মানুষের আনন্দ আছে তাই এই ছড়িয়ে দেওয়া, প্রকাশ হওয়া। এ'কে আশ্রয় করে' মানুষ যে প্রতিদিন মনে করে যে সে তার প্রয়োজন সাধন করে' নিচ্ছে, সেটা তার পাটোয়ারী বুদ্ধির মাপ-কাঠি। কিন্তু মানুষের সম্বন্ধে, সমস্ত সৃষ্টির সম্বন্ধে যেটা খাঁটি নিছক সত্য সেটা হচ্ছে ঐ আনন্দের খেলা। এই আনন্দকে বুকে করে', এই আনন্দময় জগতে মানুষ ক্ষুদ্র অন্ধকার কুঠুরীতে চোখ বুঁজে চিরকাল বসে' থাক্‌তে পারে না। সে যে চায় আলো, সে যে চায় বাতাস। সে যে চায় অন্তরের সঙ্গে বাহিরের মিলন—বাহিরের সঙ্গে অন্তরের মিলন। সে চায় হৃদয়ের রঙে বিশ্বটা রঙিয়ে তুল্‌তে—বিশ্বের রঙে হৃদয়টা পূর্ণ কর্‌তে। আর এই হচ্ছে পঞ্চক—এই হচ্ছে মানুষ। আর এইটে হচ্ছে "অচলায়তনের" মূল কথা।

কিন্তু এই যে পঞ্চক—এই যে মানুষ—এই যে তার জীবন-দেবতার প্রেরণা—যে প্রেরণার বলে আবহমান কাল হ'তে বিশ্ব-, মানবের অন্তরে

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ

সত্য হ'য়ে ফুটে আছে—তা সার্থক কর্‌বার পক্ষে মস্ত বাধা পঞ্চককে ঘিরে আছে অচলায়তনের আকাশ-জোড়া প্রাচীর; আর তার মনের চারপাশে ঘিরে আছে পঞ্চাশ হাজার বছরের রাশীকৃত পুঁথি আর তার সংখ্যাহীন শ্লোক। পঞ্চকের ঘরের চারপাশে যে প্রাচীর তা যত বড় বড় পাথর দিয়েই গড়া হোক্ না কেন—যত উঁচু করেই গাঁথা হোক্ না কেন—তা ফুৎকারে কোথায় উড়ে যেত—বালার্কের স্পর্শে নীহার-স্তূপের মত মুহূর্ত্তে কোথায় মিলিয়ে যেত যদি না থাক্‌ত তার মনের চারপাশে ঐ অসংখ্য পুঁথি আর তার সংখ্যা-বিহীন শ্লোক। অন্তর-দেবতার যে সত্যিকার বন্ধন তা অচলায়তনের প্রাচীরে নেই—তা আছে, পুঁথির "কাকচঞ্চু পরীক্ষায়", "দ্বাবিংশ পিশাচভয়ভঞ্জনে"। এই অচলায়তনে বিধির চাইতে নিষেধ বেশী—কারণ এখানে সাহসের চাইতে ভয় বেশী। যেখানে প্রতি পদে বাধা মান্‌তে হবে—প্রতি মুহূর্ত্তে ভয় করে' পা ফেল্‌তে হবে—সেখানে মানুষ হ'য়ে ওঠে অমানুষ, দুনিয়া হ'য়ে ওঠে অসুখের জায়গা। সেখানে অচলায়তনের উঁচু প্রাচীর খাড়া করে' বাহিরটাকে চিরকাল বাহিরে রাখাই ভাল—সেখানে জীবনটাকে গ্রন্থির পর গ্রন্থি লাগিয়ে কসে' বেঁধে রাখাই হয়ত সুবিধার কথা, কিন্তু মানুষের জীবন-দেবতার সার্থকতা সেখানে মিল্‌বে না কিছুতেই—পঞ্চকের সেখানে হাহা-কার—মানুষের সেখানে জীবন্মৃত্যু।

পঞ্চকের সেখানে চির-হাহাকার। সে যে রাশীকৃত পুঁথির চাপে আপনার জীবন-দেবতাকে ঢাক্‌তে পারেনি—পঞ্চাশ হাজার শ্লোকের কল কল কলরোলের মাঝে আপনার জীবন-দেবতার সত্যিকার কথাটা ডুবিয়ে দিতে পারে নি। তার জীবন-দেবতা যে নিশিদিন তার অন্তরে অন্তরে অভিমানের সুরে ডাক্‌ছে—"পঞ্চক" "পঞ্চক"। হায়! এ ডাক ত অচলায়তনের আর কেউ শোনে নি।

তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে
কেউ তা জানে না,
আমার মন যে কাঁদে আপন মনে
কেউ তা মানে না।
ফিরি আমি উদাস প্রাণে,
তাকাই সবার মুখের পানে,
তোমার মতন এমন টানে
কেউ ত টানে না।

না, এমন করে' আর কেউ টানে না পঞ্চককে—যেমন করে' টান্‌ছে তার অন্তরের জীবন-দেবতা—কেউ না—পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে ছাপ্পান্ন হাজার পুরুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছে যে পুঁথিগুলো, যে শ্লোকগুলো, যে ক্রিয়াগুলো, যে আচারগুলো—সে-গুলো ত নয়ই। জীবন-দেবতার ডাকে পঞ্চক পাগল—বসন্তাগমে রুদ্ধকণ্ঠ কোকিলের আকুলতার মতো তার আকুলতা—ছায়ায় বর্দ্ধিত কুসুমলতার আলোর দিকে ধাওয়ার মতো তার ব্যাকুলতা—কোথায় পড়ে রইল

তার "তট তট তোতয় তোতয়"—তার "ধ্বজাগ্রকেয়ূরী" "চক্রেশমন্ত্র" —সেই অচলায়তনে সেই আলোঢাকা বাতাস বন্ধকরা প্রাচীরের মাঝে পঞ্চকের গলা চিরে গান বেরিয়ে এল—

বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর,
কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হ'তে দুয়ারে কর
কেউ ত হানে না।

এ যে আশ্চর্য্য ব্যাপার! এ যে অচলায়তনের বিরুদ্ধে মানুষের জাজ্বল্যমান বিদ্রোহের সূচনা! অচলায়তনের প্রতিষ্ঠা হওয়া থেকে এ ব্যাপার কেউ দেখে নি, কেউ শোনে নি, কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি। কত শ' বছর কে জানে তার পেষণেও মানুষের জীবন-দেবতা মরল না! সে আজও অচলায়তনে জন্মে অচলায়তনে মানুষ হ'য়ে ছুটে বেরুতে চায়—আপনার আনন্দে—বিশ্বের মাঝে—খোলা আকাশের তলে! না, জীবন-দেবতা মরে নি—মরতে পারে না। ভগবান তেমন কাঁচা শিল্পী নন। পঞ্চকের অন্তরে অন্তরে জীবন-দেবতার জয় হয়েছে। বাহিরেও তার জয় হবে নিশ্চয়। সেদিন বুঝি "অচলায়তনের" প্রাচীরের একটী পাথরও খাড়া হ'য়ে থাকবে না।

৩

ঐ যে শোণপাংশুরা—যারা খেঁসারি ডালেরও চাষ করে আবার লোহাও পেটে, যারা নাপিত ক্ষৌর করতে করতে বাঁ গালে রক্ত

পাড়িয়ে দিলে উল্টে নাপিতের গালে চড় কসিয়ে দেয়, আবার খেয়া নৌকয় উঠ্‌তেও তারা সেদিন কোনই ভয় করে না—অথচ এ সত্ত্বেও যারা একেবারে জাতকে-জাত অধঃপাতে যায় নি—সমস্ত সৃষ্টির সঙ্গে তাদের এমনি একটা সহজ স্বাভাবিক প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ আছে যে, তাদের বাড়ীর উত্তর দিকে একজটাদেবীও ভয় দেখাবার জন্যে বসে' থাকে না কিম্বা কারও গায়ের উপর হাত তুল্‌লেও তাদের আয়ু কমে যায় না। তারা হয়ত বাড়ীর উত্তর দিকটায় দিব্যি চাষ করে, সেখানে খেঁসারি ডালের বীজ বুনে দেয়—একজটা-দেবীর একগাছি চুলও সেখান থেকে বেরয় না—বেরয় যা সেটা চমৎকার তাজা সোনারবরণ খেঁসারি ডাল অথচ এদের বজ্রবিদারণ-মন্ত্রও নেই, দ্বাবিংশপিশাচভয়ভঞ্জনও নেই—হাজার প্রকার ভয় তাড়ানোর কোন মন্ত্রই নেই—বুঝি এদের কোন ভয়ই নেই। অথচ —কিম্বা বুঝি সেই জন্যেই—এই শোণপাংশুদের এমন একটা শ্রী আছে, এমন একটা উল্লাস আছে যে অচলায়তনের বালকদেরও তা নেই।

কারণ এই যে শোণপাংশুরা—এরা বেড়ে উঠেছে আপনারই আনন্দের ভিতর দিয়ে। এদের দৈনন্দিন কর্ম্মগুলো এদের এমন একটা সার্থকতা পাইয়ে দিয়েছে—এমন একটা রস পাইয়ে দিয়েছে যে সেই রসের আনন্দে তাদের প্রাণ ভরপুর; আর সেই প্রাণের আনন্দ, তাদের চোখে মুখে ললাটে আপনার ছায়া ফেলে তাদের করে' তুলেছে শ্রীমান্, আনন্দমূর্ত্তি। কিন্তু ঐ যে "অচলায়তন" যেখানে দশ হাজার শ্লোকে মিলে বিশ হাজার প্রায়শ্চিত্তের

ব্যবস্থা দিচ্ছে—সেখানকার যে মানুষগুলো—তারা চল্‌ছে না, বসে' রয়েছে—জীবন-দেবতার আনন্দে নয়। কারণ এরা যা কিছু করে, যা কিছু শেখে তার সঙ্গে এদের প্রাণের যোগ কোনখানেই নেই—এমন কি বুদ্ধির যোগও নেই। কারণ তাদের যে-সব মন্ত্র-তন্ত্র ক্রিয়া-কলাপ তার সম্বন্ধে কারও কোন প্রশ্ন কর্‌বারও অধিকার নেই। "হয় সেটা মান, নয় কানমলা খেয়ে বেরিয়ে যাও, মাঝে অন্য রাস্তা নেই।" এ সবের সঙ্গে এদের যে যোগ সেটা হচ্ছে অভ্যাসের যোগ—আর এই অভ্যাস সম্ভব হয়েছে অতীতের শাসনে। আর সেইজন্যে এদের মধ্যেকার যে "মানুষটা" সেটা ব'য়ে চলেছে একটা বিরাট ব্যর্থতা। কারণ মানুষের সম্বন্ধে সবার চাইতে সত্য যে কথাটা সেটা হচ্ছে এই যে, মানুষ কল নয়। কিন্তু এমনি অভ্যাসের বল যে, এরা যে একটা বিরাট ব্যর্থতাকে বহন করে' চলেছে সে কথাটাও এরা জান্‌ছে না—কেবল যে জান্‌ছে না তাই নয়, উল্টে আবার মনে কর্‌ছে যে এইই অমৃত এইই মুক্তি এইই আনন্দ। কিন্তু তবুও এদের মধ্যেকার "মানুষ" একেবারে মরে নি। এখনও একটু একটু তার স্পন্দন আছে। তাই যেদিন দাদাঠাকুরের দল এসে অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙ্গে মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে দিলে আর সমস্ত আকাশটা যেন ঘরের মধ্যে দৌড়ে এল, সেদিন তাদেরও প্রাণটা নেচে উঠলো—সেদিন যখন বালকেরা শুনলে যে ষড়াসন বন্ধ, পংক্তিধৌতির দরকার নেই তখন তারা দুঃখিত হ'ল না মোটেই —সেদিন তাদের "কি মজা রে কি মজা"। পঞ্চকের দু'ধারে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। একদিকে শোণপাংশুরা, আর একদিকে "অচলায়তন"

—একদিকে তার প্রাণের ডাক গানের ডাক, আর একদিকে তার অতীতের আদেশের, অতীতের শাসনের ডাক—একদিকে খোলা আকাশের ডাক, আর একদিকে বন্ধ পুঁথির ডাক—একদিকে জীবনের আনন্দের ডাক, আর একদিকে মরণের শান্তির ডাক। পঞ্চককে কে জিতে নেবে? মানুষ কোথায় আপনার অমৃত খুঁজে পাবে? পঞ্চক তার মুক্তি অচলায়তনের বন্ধ পুঁথির শ্লোকের মাঝে খুঁজে পেলে না, খুজে পেলো তা খোলা বাতাসের সুরের মাঝে—মানুষ বুঝেছিল তার অমৃত, আঁধার-ঢাকা অচলায়তনের মধ্যে নেই, তা আছে আলোকমাখা আকাশের তলে।

এইটেই হচ্ছে আসল কথা। মানুষের মুক্তি, মানুষের অমৃত—তা আছে কোথায়? তার ধরে' রাখার মধ্যে নয়, তার ছাড়া-পাওয়ার মধ্যে। মানুষের হাত পা বোঝা হ'য়ে ওঠে তখন, যখন এদের বসিয়ে রাখা যায়—নইলে এরা মানুষের আনন্দেরই কারণ। আসল কথা হচ্ছে মানুষের সম্বন্ধে একটা ভগবানের বিধি আছে—তার হাত পা চোখ কান মন প্রত্যেকের, ভগবান-দত্ত একটা ধর্ম্ম আছে। মানুষের মঙ্গল ও আনন্দ আছে সেই সেই বিধি মানার মধ্যে, হাত পা চোখ কান মনের সেই সেই ধর্ম্ম-উদ্‌যাপনের মধ্যে। মানুষের অমৃত এদের মেরে ফেলবার মধ্যে নেই—আছে এদের জীবন্ত করে' তোলবার মধ্যে। এই হচ্ছে ভগবানের বিধি—মানুষের জীবন-দেবতার ধর্ম্ম—তার সত্য কথা!

ঐ যে অচলায়তনের দল আর শোণপাংশুর দল এদের মধ্যে ঐ শোণপাংশুর দলই জীবন-দেবতার সত্যিকার কথা মেনে চলেছে—

তাই তাদের বেঁচে থাকার মধ্যে একটা পূর্ণ সার্থকতা রয়েছে—একটা জমাট আনন্দ রয়েছে—আর তাই এ জগৎটা তাদের কাছে মিথ্যা হ'য়ে ওঠে নি, মায়া হ'য়ে ওঠে নি। কিন্তু তবুও এই শোণপাংশুদের একটা মস্ত অসম্পূর্ণতা, একটা প্রকাণ্ড অভাব র'য়ে গেছে—যেটা পঞ্চকেরও চোখ এড়িয়ে যায় নি।

কারণ এই যে শোণপাংশুরা এরা জীবন-দেবতার কথা মেনে চল্‌ছে বটে কিন্তু জান্‌ছে না যে এরা জীবন-দেবতার কথা মেনে চলছে। আর তাই "এরা বাইরে থাকে বটে কিন্তু বাহিরটাকে দেখ্‌তেই পায় না।" কারণ এরা আপনার ভিতরটাকে মানে নি। দাদাঠাকুরের সঙ্গে এদের চোখের পরিচয় আছে বটে—কিন্তু তাকে এরা মন দিয়ে জানে না, প্রাণ দিয়ে চেনে না। দাদাঠাকুরকে এরা দাদাঠাকুর বলেই জানে, গুরু বলে' চেনে না। এতে বিপদের সম্ভাবনা আছে—চাই কি, একদিন এরা অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে দাদাঠাকুরের অপমানই করে' বস্‌বে।

মানুষের সকল অমঙ্গলের সূচনা হয় তখন যখন সে জীবন-দেবতাকে তার অন্তর থেকে নির্ব্বাসিত করে' তার মনের সিংহাসনে অহং-দেবতার আসন পাতে। মানুষের জীবন মিথ্যা দিয়ে ভরে' ওঠবার সুযোগ পায় তখনই। এ মিথ্যা আপনাকে বিস্তার কর্‌তে পারে দু'দিকে। এক নীচুদিকে আর এক উঁচুদিকে—এক মানুষকে অস্বীকার করার দিকে, আর এক মানুষকে অতিমাত্র স্বীকার করার দিকে—এক "অচলায়তনের" দিক, আর এক মানুষের শক্তির দানবী-লীলার দিক।

কারণ ঐ যে "অচলায়তন"—তার প্রত্যেক পাথরটা খাড়া হ'য়ে উঠেছে মানুষের বিরাট অহঙ্কারের উপর—হাজার বালকের চোখের জল দিয়ে এর চূন শুর্‌কি গোলা হয়েছে—সুভদ্র যে উত্তরদিকের জানালা খুল্‌তে চেয়েছিল বলে' তাকে ছ'মাস অন্ধকার কুঠরীতে পুরে রাখ্‌বার মন্ত্রণা হয়েছিল—অষ্টাঙ্গশুদ্ধি উপবাসে তৃতীয় রাত্রে বালক কুশলশীল যে পিপাসায় জল জল করে' প্রাণত্যাগ করলে, তবুও তার মুখে কেউ একবিন্দু জল দিলে না—এ সবের পিছনে যে একটা মস্ত বড় সত্ত্বগুণের খেলা চল্‌ছে তা মনে করবার কোনো কারণ নেই—এসব হচ্ছে মানুষের অহঙ্কারের তামসিক লীলা—আর এর অন্যদিকটা হচ্ছে মানুষের অহঙ্কারের রাজসিক লীলা—যে লীলার—কতকটা উপশমের নিতান্ত দরকার হয়েছিল বলে', বোধ হয় আরব্ধ হয়েছিল গত ইয়োরোপের মহাসমর।

এইখানেই মানুষের বিপদ। এই বিপদ থেকে বাঁচতে হ'লে চাই, জীবন-দেবতার সঙ্গে মানুষের নিবিড় মিলন। দাদাঠাকুরকে দাদাঠাকুর বলেও জানতে হবে আবার গুরু বলেও মানতে হবে। "দাদাঠাকুরের মুখের কথাকে মনের ইচ্ছা করে' তুল্‌তে হবে।" আর এ করতে হ'লে সারাদিন শোণপাংশুদের খালি পাক খেয়ে বেড়ালে চলবে না। তাদের একটু বস্‌তে শিখ্‌তে হবে। আর এর জন্য দরকার মহাপঞ্চক। "কি করে' আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে উঠ্‌তে হয়" তার মন্ত্র—"ক্ষুধা তৃষ্ণা লোভ ভয় জীবন মৃত্যুর আবরণ বিদীর্ণ করে' আপনাকে প্রকাশ করার রহস্য" আছে ঐ মহাপঞ্চকের হাতে। সেইজন্য মহাপঞ্চকেরও দরকার, একটা বড় রকমের দরকার—ঐ

"অচলায়তন" ভেঙ্গে সেখানে আকাশের আলোর মধ্যে অভ্রভেদী করে' দাঁড় করান হবে যে নূতন শুভ্র সৌধ, সেই নূতন সৌধের মাঝে। এই মহাপঞ্চক যেদিন শোণপাংশুর অন্তরে গিয়ে বস্‌বে—শোণপাংশু যেদিন মহাপঞ্চকের দেহে গিয়ে লাগ্‌বে—যেদিন মহাপঞ্চকের আত্ম-জয়ের উপরে স্থাপিত হবে শোণপাংশুর কর্ম্ম-ব্যঞ্জনা, যেদিন শোণ-পাংশুর প্রবৃত্তি মহাপঞ্চকের সংযম দিয়ে নিয়মিত হবে—সেদিন মানুষ হবে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার—দেবতার চাইতেও মহীয়ান্—দেবতার চাইতেও গরীয়ান্—ভগবানের সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি।

‘পঙ্কজ’

"ঘরেতে ভ্রমর এল গুণগুণিয়ে
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।"

চৈত্র মাস। প্রচণ্ড রোদ। তমালতালীর কাঁধে কাঁধে কোমলাঙ্গী লতিকারা সব শুকিয়ে উঠেছে। কাকেরা পর্যান্ত ডাক্‌ছে না। তারা সব নিবিড় বনে নিবিড়তম ছায়ার আশ্রয় নিয়েছে। মার্ত্তণ্ডদেব যেন সহস্রমুখ হ'য়ে চারিদিকে আগুন ঢেলে দিচ্ছেন। রাস্তার পথে পশ্চিমে হাওয়ায় তপ্ত ধূলি উড়্‌ছে সাংঘাতিক। কিন্তু সে হাওয়া সে ধূলি অচলায়তনের দেয়াল পর্য্যন্ত এসে থেমে যাচ্ছে। তাদের প্রবেশ এখানে নেই। বাহিরের সুখ বাহিরের দুঃখ, বাহিরের হাসি বাহিরের অশ্রু—বাহিরের আশা আকাঙ্ক্ষা, উল্লাস আনন্দ—সে-সবের প্রবেশ এখানে জন্ম-জন্মান্তর থেকে নিষিদ্ধ। এখানে, সে হচ্ছে অচলায়তন। যেখানে হাজার হাজার বছরের বাধা রাস্তায় বাঁধা নিয়মে বাঁধা জীবনের ভিতর দিয়ে পাকা মানুষ তৈরী হ'য়ে উঠ্‌ছে। এখানে একটু কারও ভুল কর্‌বার আশঙ্কা নেই—একটু কারও পথভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই। এটা হচ্ছে মানুষের সুপ্তির স্থান—এটা হচ্ছে নাকি মানুষের মুক্তির মন্দির!

রাজার পথে মত্ত হাওয়ায় তপ্ত ধূলি উড়ুক—কিন্তু এখানকার গাছের পাতাটী পর্য্যন্ত নড়্ছে না। কি জানি যদি সে নড়াতে একটু কিছু ঘুলিয়ে যায়। কি জানি যদি সে নড়া দেখে কারও মনে প্রশ্ন ওঠে যে গাছের পাতাগুলো নড়ে কোন্ নিয়মে। আর সেটার উত্তর বের করতে গেলে হয়ত অচলায়তনের প্রাচীরগুলো পর্যান্ত পাগল হ'য়ে একদিন উঠে হাঁট্‌তে লেগে যাবে। তাই এখানের গাছের পাতাটী পর্য্যন্ত নড়ে না। এখানকার পাখীগুলো পর্য্যন্ত ডাকে শাস্ত্রানুসারে—তাদের ডাক বনের পাখীর ডাকের মত তেমন অকেজো একেবারেই নয়। তাদের প্রত্যেক ডাকের একটা ভীষণ রকম মন্ত্র আছে। কোনটায় বা দিনশুদ্ধি হচ্ছে—কোনটায় বা রাত্রিশঙ্কা হরণ কর্‌ছে—কোনটায় পিশাচ-ভয়ভঞ্জন ঘটছে—কোনটায় বা সর্পভয়নিস্তারণ আস্‌ছে। চারিদিকে সাংঘাতিক শান্তি নিদ্রার চাইতেও আবেশময়—মৃত্যুর চাইতেও মৌন—এটা হচ্ছে নাকি মানুষের মুক্তির মন্দির!

সেই চৈত্রমাসে প্রচণ্ড গ্রীষ্মে মধ্যাহ্নভোজন সমাপন করে' অচলায়তনে যে যার যার মতো আপন আপন কক্ষে আশ্রয় নিয়েছে—সেই বিরাট শান্তি উপভোগ কর্‌বার জন্যে। কিন্তু বেচারা পঞ্চকের আর শান্তি নেই। তার উপর আজ কড়াক্কড় হুকুম হয়েছে যে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তা'কে অজতন্ত্র থেকে শৃঙ্গীশাপ মোচনের স্বস্ত্যয়নটা মুখস্ত কর্‌তেই হবে। নইলে তার জলস্পর্শ নিষিদ্ধ! পঞ্চক বৃহৎ অজতন্ত্রখানা কোন রকমে টেনে তার আপনার কক্ষে এনে শৃঙ্গীশাপমোচনটা বার বার করে' আবৃত্তি কর্‌ছিল আর

পূর্ব্বজন্মে তার মাথার ওপরে দুটো শৃঙ্গ থাকার কতটা সম্ভাবনা ছিল এবং পরজন্মে তার মাথায় শৃঙ্গ গজাবার কতটা সম্ভাবনা জমা হ'য়ে উঠ্‌ছে তাই এক একবার ভাব্‌ছিল। পঞ্চক যত বেশী করে' তার মন সেখানে লাগাতে যাচ্ছিল অজতন্ত্রখানা যেন তত বেশী দুর্ব্বোধ্য হ'য়ে উঠ্‌ছিল। যত বেশীবার সে পড়্‌ছিল তত বেশী তার মন লাগ্‌ছিল না। এই রকম যখন পঞ্চকের সঙ্গে আর অজতন্ত্রের সঙ্গে একটা বিরাট সংগ্রাম চল্‌ছিল তখন কোথা থেকে কোন্ পথ দিয়ে কোন রন্ধ্র খুঁজে হঠাৎ—

ঘরেতে ভ্রমর এল গুণগুণিয়ে,—

পঞ্চকের হৃদয়টা যেন চক্ষের পলকে মুখের মধ্যে লাফিয়ে এলো—তার মর্ম্মতলের কোথায় কোন্ নিভৃতে একটী বহুদিনের ভুলে-যাওয়া মর্‌চে-ধরা তারে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল—অজতন্ত্রের অক্ষরগুলো পিঁপড়ের সারের মতো যেন ধীরে ধীরে কোথায় মিলিয়ে গেল—প্রকাণ্ড পুঁথিখানা যেন কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল—পঞ্চক তার কান মন প্রাণ—তার সমস্ত অস্তিত্বটা দিয়ে শুন্‌লে সেই ক্ষুদ্র ভ্রমরের গুণ্‌গুণ্ গুঞ্জন—

আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে

ওগো আমায় কার কথা সে শুনিয়ে যায়! এই সহস্র সহস্র বৎসর খাড়া হ'য়ে আছে যে অচলায়তন—যেখানে ভাবনা নেই চিন্তা নেই—আশা নেই আকাঙ্ক্ষা নেই—দুঃখ নেই সুখ নেই—যেখানে আছে শুধু অভ্যাস আর সোয়াস্তি—যেখানে আছে শুধু শান্তি আর সংযম—সেখানে ঐ একরত্তি ভ্রমরটুকু এসে কার কথা শুনিয়ে যায়।

ওগো আমায় কার কথা সে শুনিয়ে গেল! হায় পঞ্চক!

ঐ একরত্তি ভ্রমরটুকু! কোন্ শক্তি তার ক্ষুদ্র দুটী পাখাতে জড়িয়ে সে এ জগতে এসেছে! কোন্ শক্তি? তার সে-শক্তিতে যে আজ অচলায়তনের চব্বিশ হাত উঁচু সাত হাত পুরু দেয়াল কেঁপে উঠ্‌ল—তার সে গুণ্‌গুণ্ গুঞ্জনে যে বড় বড় সমাসের ঢাকের বাদ্য, বড় বড় অলঙ্কারের করতালের ঝম্ ঝম্ ধ্বনি সব বেখাপ্পা হ'য়ে উঠ্‌ল! ঐ একরত্তি ভ্রমরটুকু! তার আলাপে যে আজ শাস্ত্রের নিষেধগুলোকে প্রলাপের মতো মনে হচ্ছে! আজ যে ঐ রত্তিটুকু ভ্রমরের গুঞ্জনধ্বনির পাছে পাছে বেরিয়ে পড়্‌বার জন্যে অন্তর-দেবতার আসন থেকে তাগিদ্ আস্‌ছে—ঐ গুঞ্জনধ্বনির পাছে পাছে—দীপ্ত আকাশের তলে তলে—মুক্ত বাতাসের সুরে সুরে—বুঝি—বুঝি—সেই কথা আমাকে শুনিয়ে যায়—হায় আজ

কেমনে রহি ঘরে
মন যে কেমন করে
কেমনে কাটে গো দিন দিন গুণিয়ে।

না, দিন আর কাটে না। পঞ্চকের দিন আর কাট্‌বে না এখানে—এই অচলায়তনে। কোন্ মায়া বিস্তার করে' আজ ক্ষুদ্র পতঙ্গ পঞ্চকের রুদ্ধ অন্তরের দ্বার খুলে সেখানে কার আহ্বান, কার সংবাদ রেখে গেল। ঐ ক্ষুদ্র ভ্রমরের গুণ্‌গুণ্ ধ্বনির সঙ্গে পঞ্চকের হৃদয়-বীণার কোন্ পরদার কোন্ তারটী সৃষ্টির আদি থেকে বাঁধা ছিল যে আজ তার গুঞ্জন পঞ্চকের কান দিয়ে পশে' সেই তারটায় আঘাত কর্‌লে—সে-তার যে মুহূর্ত্তে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল—

পঞ্চককে পাগল করে' দিয়ে গেল। সে-সুরের স্পর্শে কোন্ পুরুষ জেগে উঠ্‌ল পঞ্চকের অন্তরে অন্তরে—কোন্ পুরুষ—যে এতদিন কোন কথা কয় নি, কোন সাড়া দেয় নি—পঞ্চাশ হাজার বছর সে এমনি করে' লুকিয়ে ছিল। কে জান্‌ত যে এমন কেউ আছে পঞ্চকের অন্তরে যে এই অচলায়তনের দেড় হাত জায়গায় আঁটবে না। যদি জান্‌ত তবে বুঝি ঐ অচলায়তনের বিরাট প্রাচীর অমন সগর্ব্বে আকাশে মাথা উঁচু করে' দাঁড়াতেই পার্‌ত না। যখন এক-বার দাঁড়িয়েছে—যখন পঞ্চকের অন্তরে সেই বিরাট পুরুষ জেগেছে তখন সেই প্রাচীরের উদ্ধত মস্তক নীচু কর্‌তেই হবে—নইলে যে পাথরগুলো দিয়ে ও প্রাচীর তৈরী হয়েছে, সে পাথরগুলোকে তুচ্ছ বালিরাশির মতো ঝুর্ ঝুর্ করে' ধসে' পড়্‌তে হবে—অন্য উপায় নেই। ঐ প্রাচীর খাড়া করে' রাখ্‌তে হ'লে পঞ্চককে মরতে হবে। পঞ্চক মর্‌বে! অসম্ভব—পঞ্চকের মর্‌বার উপায় নেই—পঞ্চককে যে বাঁচ্‌তেই হবে।

পঞ্চককে বাঁচ্‌তেই হবে—ভগবানের আদেশ। ভগবানের আদেশেরও উপরে যারা আদেশ চালাতে চাইবে তাদের এই বিশ্ব-মানবের মহা মেলায় অপমান হবে পদে পদে, পলে পলে। যারা পঞ্চককে ঘিরে রাখ্‌তে চাইবে তারা ভগবানকেই বন্দী কর্‌বে—আর ভগবানকে বন্দী কর্‌লে ভগবানের কোন ক্ষতি নেই কিন্তু মানুষের অকল্যাণ ও অমঙ্গল হবে—আর তার পরিমাণ হবে হিমাদ্রির চাইতেও উঁচু, সিন্ধুর চাইতেও গভীর।

সমস্ত জগৎ জুড়ে যে আনন্দের সুর নিশিদিন বাজ্‌ছে সেই

আনন্দের সুর যারা কান পেতে হৃদয়ের তলে তলে শুনতে পায় নি—যে আনন্দের আলোক সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে আছে সে-আলোক যারা মানুষের মর্ম্মে মর্ম্মে আঁখি মেলে দেখ্‌তে চায় নি তাদের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে আপনার চারপাশে গণ্ডি টেনে দিয়ে এ জগতকে দেখা দুঃখময় করে’, অমঙ্গলময় করে’, অশুচি করে’, অপবিত্র করে’—তাদের পক্ষেই মানা সম্ভব হয়েছে এ জগতটা সয়তানের সৃষ্টি—এ জগৎ সয়তানের ইসারায় চল্‌ছে। কোথায় গো তোমার ভগবান যদি তিনি ঐ মুক্ত উদার নীল আকাশের মাঝে নেই—যদি তিনি ঐ বর্ষার কালো মেঘের ঝিলিক্‌-হানা গুর্‌ গুর্‌ ডাকের মধ্যে নেই—যদি তিনি প্রথম আষাঢ়ের ঝর্‌ ঝর্‌ ধারায় ভেজা চষা-মাটির গন্ধে নেই—ঐ ক্ষুদ্র ভ্রমরটুকুর পক্ষগুঞ্জনে নেই—মানুষের হৃদয়তলের মুক্তির সঙ্গীতে নেই। কোথায় আছেন তিনি—কোথায় তাঁকে বন্দী করে’ ক্ষুদ্র করে’ অক্ষম করে’ লুকিয়ে রেখেছ? কোথায় তাঁকে অশুচি করে’ ভীত শঙ্কিত করে’, মিথ্যা করে’, অপমানিত করে’, অপরাধের সীমা বাড়াচ্ছ? হায়! অচলায়তনের কারও চোখে পড়ে নি যে ভগবানকে বাঁধ্‌তে গিয়ে তারা নিজেরাই বাঁধা পড়েছে—ভগবান যেমন তেমনি আছেন—তাঁর সৃষ্টি যেমন চল্‌ছিল তেমনি চল্‌ছে।

পঞ্চকের আর এ অচলায়তনে থাকা চল্‌বে না—কিছুতেই না। আজ যে ঐ ক্ষুদ্র ভ্রমরটুকুর মৃদু-গুঞ্জনধ্বনি সমস্ত জগতের আনন্দের প্রতিনিধি হ’য়ে এসে পঞ্চকের প্রাণে প্রাণে আগুন ছুটিয়ে দিয়ে গেল। ওগো—জাগো—জাগো—শতাব্দী শতাব্দী ধরে’ নিজের

চারদিক অন্ধকারে জড়িয়ে যে আলোকের সন্ধান কর্‌ছিলে প্রাণে আনন্দ নিয়ে একবার তাকিয়ে দেখ সে-আলোক ঐ মুক্ত নীল আকাশ ছেয়ে আছে—সে আলোক বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে চলেছে—সে আলো প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দনে নাচ্‌ছে—সে-আলো হৃদয়-বীণার সুরে সুরে বাজ্‌ছে—ঐ যে সে "আলোর স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি"—ঐ যে সে "আলোর ঢেউয়ে উঠ্‌ল মেতে মল্লিকা মালতী"—সে আলোক মানুষের কর্ম্মে আশায় আকাঙ্ক্ষায় প্রেমে ভক্তিতে প্রীতিতে শ্রদ্ধায় আপনাকে ছড়িয়ে দিয়ে আছে। না, পঞ্চকের আর এখানে থাকা চল্‌বে না। পঞ্চকের প্রাণে প্রাণে যে আজ সেই আনন্দ-আলোকের স্রোত ছুটেছে—সে-স্রোতে যে সব ভেসে গেল—যত অপমান অপরাধ, শতাব্দীর বন্ধন—শত সহস্র শ্লোকের ভারী ভারী শৃঙ্খল আজ সব তুচ্ছ তৃণের মত পট্‌ পট্‌ করে' ছিঁড়ে গেল—পঞ্চককে আজ কে ধরে' রাখ্‌বে—কার সাধ্য—

হারে রে রে রে রে
আমায় ছেড়ে দেরে দেরে।
যেমন ছাড়া বনের পাখী
মনের আনন্দে রে।
ঘন শ্রাবণ-ধারা
যেমন বাঁধন-হারা
বাদল বাতাস যেমন ডাকাত
আকাশ লুটে ফেরে।

'পঞ্চক'

হারে রে রে রে রে
আমায় রাখবে ধরে কেরে
দাবানলের নাচন যেমন
সকল কানন ঘেরে।
বজ্র যেমন বেগে
গর্জ্জে ঝড়ের মেঘে
অট্ট হাস্যে সকল বিঘ্ন-বাধার বক্ষ চেরে।

ছুট্‌বে—আজ পঞ্চক ছুট্‌বে—ছুট্‌বে আজ সে চন্দ্র গ্রহ তারায় আপনার প্রাণের সঙ্গীত ছড়িয়ে দিয়ে দিয়ে—ছুট্‌বে আজ সে এই বিস্তৃত পৃথিবীর বক্ষে মরু গিরি কান্তারে, নগর নগরী পল্লীতে আপনার চরণ-চিহ্ন এঁকে এঁকে—ছুট্‌বে আজ সে ঐ প্রভঞ্জন-পাগল সফেন-তরঙ্গোচ্ছ্বসিত ক্ষুব্ধ অশান্ত সিন্ধুর বক্ষ দলিত মথিত শাসিত করে'! ছুট্‌বে আজ সে শীত গ্রীষ্ম বর্ষার ভিতর দিয়ে দিয়ে—অগ্নি জল বায়ুর মধ্য দিয়ে দিয়ে—ঐ বিশ্বমানবের মহা কোলাহলের, মহা সংগ্রামের মাঝ দিয়ে দিয়ে আপনার প্রাণের আনন্দের আগুন ছড়িয়ে ছড়িয়ে—তা'তে যদি পঞ্চকের অপঘাত মৃত্যুও হয় ক্ষতি নেই—অন্ততঃ তা'তে কিছু সার্থকতা আছে। অচলায়তনে ঐ শ্বাস-রুদ্ধ হ'য়ে মরার চাইতে সে-মৃত্যু অনেক গুণে শ্রেয় ও প্রেয়।

২

"এ পথ গেছে কোন্‌খানে গো কোন্‌খানে
তা কে জানে তা কে জানে।"

ঐ যে শোণপাংশু-পল্লীর বুক চিরে টিয়ে পাখীর চাইতেও সবুজ ধানের ক্ষেতের মাঝ দিয়ে পৃথিবীর বুকে এঁকে বেঁকে মাটীর পথটা বহুদূর চলে' গিয়ে কুয়াশার মত গাছপালার ভিতরে লুকিয়ে গেছে—সে-পথ গেছে কোন্‌খানে—তা কে জানে? ঐ পথটী বেয়ে বেয়ে সৃষ্টির আদি থেকে কত নর নারী কত দেশ জাতি কত গান কত সুর—কত হাসি কত অশ্রু আপনার আপনার গান গেয়ে চলে গেছে—কোথায়? তা কে জানে তা কে জানে! কোন্ পাহাড়ের পারে নিয়ে নিয়ে গেছে তাদের ঐ পথ—কোন্ সাগরের ধারে নিয়ে গেছে তাদের ঐ রাস্তা—এ পথ বেয়ে কোন্ দুরাশার সন্ধানে তারা যাত্রা করেছিল—তাদের অশ্রু শেষ হয়েছিল কোথায়—তা কে জানে? বুঝি কেউ জানে না।

তা না জানুক্ তবুও ঐ পথ বেয়েই চল্‌তে হবে। এই চলাতেই যে আনন্দ। যারা প্রত্যেক পাদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে আপনার লাভ ক্ষতির হিসেব করে' করে' চলে, তারা মানুষের অন্তরের জীবন-দেবতার আনন্দ-মন্ত্রের সংবাদ পায় নি—বুঝি কোন দিন পাবেও না। এ সৃষ্টিটা যে সমস্ত অহৈতুক—এখানকার লাভটাই যে খুব লাভ নয়, ক্ষতিটাই যে খুব ক্ষতি নয়—তা তারা বুঝ্‌বে না কোন দিন। ঐ যে আনন্দ মন্ত্র—যে মন্ত্রে উষার সঙ্গে সঙ্গে বনে বনে জঙ্গ

ফুল গাল-ভরা হাসি নিয়ে ফুটে ওঠে—তারা কি খোঁজ করে এতে তাদের লাভ কি? তারা যে না ফুটে পারে না—সৌরভ না ছড়িয়ে যে তারা বাঁচে না। সেটাই যে তাদের সত্য। ফোটাতেই তাদের সার্থকতা—সৌরভ ছড়ানতেই তাদের গৌরব। যখন মানুষ ঐ আনন্দ-মন্ত্রে সঞ্জিবীত হ'য়ে উঠ্‌বে—ঐ আনন্দ-মন্ত্রে দীক্ষিত হবে তখন "এ পথ গেছে কোন্‌খানে" এ প্রশ্ন মনে জাগ্‌লেও কোন সন্দেহ, কোন শঙ্কা তার প্রাণে বাজ্‌বে না। সে যে তখন থেমে থাকতে পার্‌বেই না। তার চলাতেই যে তখন আনন্দ। প্রত্যেক পাদক্ষেপে যে তখন তার সুর বেজে উঠ্‌বে। প্রত্যেক অঙ্গসঞ্চালন থেকে তার তখন সৌন্দর্য্য ঝরে' পড়্‌বে। সে তখন বুঝ্‌বে যে সমস্তের সার্থকতা তার আপনার মধ্যেই লুকিয়ে আছে। সে যে—

"খসে যাবার ভেসে যাবার
ভাস্‌বারই আনন্দে রে!"

সে যে—

"জ্বালিয়ে আগুন ধেয়ে ধেয়ে
জ্বল্‌বারই আনন্দে রে!"

সে যে—

"ফেলে দেবার ছেড়ে দেবার
মরবারই আনন্দে রে।"

সে যে—

"লুটে যাবার ছুটে যাবার
চল্‌বারই আনন্দে রে।"

এ কবি-কল্পনাও নয়—পাগলের প্রলাপও নয়। এ ভগবানের সৃষ্টিলীলার নিগূঢ় সত্যটুকু। তাই পঙ্ক চল্‌বে—ঐ পথ ধরেই সে চল্‌বে—এই চলাই যে তার সত্য—এই চলাতেই রয়েছে তার অমৃত।

৩

আজ আমরা সবাই অপেক্ষা করে' বসে' আছি কবে ভগবানের ইঙ্গিতে বাঙ্গালার সহরে সহরে পল্লীতে পল্লীতে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পঙ্কের জন্ম হবে। কবে পঙ্কের প্রাণের অদম্য বেগের মুখে যত আলস্য যত জড়তা সব ভেসে যাবে—যত জীর্ণতা যত মিথ্যা সব খসে যাবে—যত শঙ্কা যত অধর্ম্ম সব চক্ষের পলকে অদৃশ্য হবে। সে দিন "সনাতন জড়তার" দেয়াল ভেঙে সত্যের পথ মুক্ত হবে। সত্য যে দিন আপনার পথ পাবে—যে দিন আমরা আর সত্যকে ঠেলে রাখ্‌ব না—দাবিয়ে রাখ্‌ব না সেই দিন এই বাঙ্গালার মরা গাঙে বান আস্‌বে—বাঙ্গালীর মরা প্রাণে স্রোত খুল্‌বে। মানুষ যখন সত্য হ'য়ে উঠ্‌বে তখন সুন্দর ও মঙ্গল তার কাছ থেকে কিছুতেই দূরে থাক্‌তে পারবে না।

শক্তিমানের ধর্ম্ম

"সদর বড় না অন্দর বড় ?"—"মানুষের বাহিরটা বড় না তার ভিতরটা বড় ?"—এই হচ্ছে "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" আর "বুদ্ধিমানের কর্ম্ম" এই দুটোর মধ্যে আসল তর্কটা। হিন্দুর পক্ষে কি তার রাষ্ট্রীয় অবস্থা, কি তার সামাজিক ব্যবস্থা এ দুটোর কোনটাই যে বর্ত্তমানে তেমন মোলায়েম নয় তা রবীন্দ্রনাথও বলেন আর বিপিন বাবুও মানেন—কিন্তু যত মতভেদ সে শুধু এর কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নিয়ে—cause ও effect নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ বল্‌ছেন—সমাজটা হচ্ছে ঘোড়া আর রাষ্ট্রটা হচ্ছে গাড়ী। এই সমাজ-ঘোড়া বলিষ্ঠ ও মুক্ত না হলে' সে ঐ রাষ্ট্র-গাড়ীকে টানতে পারবে না। বিপিন বাবু বল্‌ছেন—Oh no, I beg your pardon that is—রাষ্ট্রটাই হচ্ছে ঘোড়া আর সমাজটা হচ্ছে গাড়ী—রাষ্ট্র-ঘোড়া শক্ত না হ'লে সমাজ-গাড়ী চিরকাল তক্তা হ'য়েই কাল কাটাবে।

রাষ্ট্রের তুলনায় মানুষের সমাজটা তার অন্দর। আবার সমা-জের তুলনায় মানুষের মনটা তার অন্দর। রবীন্দ্রনাথ বল্‌ছেন—এই মন-অন্দরের উপরে আমরা শত সহস্র নিষেধের ঘোমটা টেনে দিয়ে, অক্ষমতার সুতোয় বোনা এমনি কালো পুরু আরামের পরদা

দাঁড়িয়ে দিয়েছি যে রাষ্ট্রের মুক্ত হাওয়া আর সেখানে আস্‌তে পারছে না। বিপিন বাবু বল্‌ছেন—Fiddlesticks—বাজে কথা। রাষ্ট্রের হাওয়াটা এসে পড়ুক ও ঘোমটা টোনটা কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

এই মতভেদের মূলে একটা philosophyর ভেদ আছে। রবীন্দ্রনাথ বল্‌ছেন—মানুষের ভিতরটা দিয়ে তার বাহিরটা নিয়ন্ত্রিত হয়। আর বিপিন বাবু বল্‌ছেন—মানুষের বাহিরটা দিয়েই তার ভিতরটা গড়ে' ওঠে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে আমাদের আত্মাটা আমাদের দেহটাকে গড়ে' তুলেছে। অপরপক্ষে বিপিন বাবুর মতে আমাদের দেহটাই আমাদের আত্মার জন্ম দিয়েছে। এ মত শুনে হিন্দু-দর্শনের প্রতি যার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা আছে তারই চক্ষুস্থির হবে নিশ্চয়। কিন্তু "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" আর "বুদ্ধিমানের কর্ম্ম" এ দুটোর আসল অমিলটা হচ্ছে ঐ গোড়ার কথায়।

রবীন্দ্রনাথ আমরা আজ যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছি তার জন্যে দায়ী কর্‌তে চান আমাদের নিজেকে। আর বিপিন বাবু তার জন্যে দোষী কর্‌তে চান মহম্মদ গজনি সাহেব ও জন্ কোম্পানীকে। এই নিয়েই ত তর্ক।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী "প্রাণের কথা" প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে উদ্ভিদ পশু আর মানুষ এ তিনের তিনটী পৃথক বিশেষ ধর্ম্ম আছে। উদ্ভিদের স্থিতি—পশুর গতি—আর মানুষের মতি। উদ্ভিদসম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন যে, উদ্ভিদ নিশ্চল অতএব তা পারিপার্শ্বিক অবস্থার একান্ত অধীন। প্রকৃতি যদি তাকে জল না জোগায় ত

সে ঠায় দাঁড়িয়ে নির্জ্জলা একাদশী করে' শুকিয়ে মরতে বাধ্য।" বিপিন বাবু আমাদের এই উদ্ভিদের ক্যাটিগরিতে ফেলতে চান। এতে আশা করি নব্য বাংলার অন্ততঃ নবীন ও তরুণ যাঁরা তাঁদের অনেকেই মনে মনে আপত্তি করবেন।

২

বিপিন বাবু একজন সুতার্কিক। কিন্তু তিনি তাঁর মতের সত্যতা প্রতিপন্ন করবার জন্যে যে-সব প্রমাণ দাখিল করেন সে-সব প্রমাণের আড়াল থেকে অনেক সময় একটা unconscious humour উঁকি মারতে থাকে। কারণ তিনি যে-সব প্রমাণ দিয়ে যে-সব সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করতে চান—ঠিক সেই-সব প্রমাণ দিয়ে তা'র উলটো সিদ্ধান্তটাও সমর্থন করা যায়। কারণ প্রমাণের আসল মজাটা ত প্রমাণের মধ্যে নেই—সেটা আছে তা'র প্রয়োগের বাহাদুরীতে। বিশেষতঃ প্রমাণ জিনিসটার মতো মুক্তজীব এ জগতে আর দুটী নেই। প্রমাণ ঐতিহাসিক ঘটনার পোষাক পরে' ভারী ভারী বড় বড় চিন্তার আশা-শোটা কাঁধে চড়িয়ে যে-কোন সত্য-মহারাজের পাছে পাছে একই রকম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে চলে—আজকার সত্য-মহারাজ যদি কালকার সত্য-মহারাজের ঘোর বিরুদ্ধও হয়, প্রমাণ-আরদালীর তা'র প্রতিও সমান খাতির। তাই বুদ্ধের নির্ব্বাণতত্ত্বের পিছনেও প্রমাণ, শঙ্করের মায়াবাদের পিছনেও প্রমাণ, আবার চৈতন্যের ভক্তিবাদের পিছনেও প্রমাণ।

এই প্রমাণের যখন এমনি জোর তখন আমরা বিপিন বাবুরই দেওয়া প্রমাণ দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধ মতটাও যে কি করে' সমর্থন করা যায় তা'র একটা উদাহরণ এখানে দিচ্ছি।

বিপিন বাবু লিখ্‌ছেন—সে লেখার ক্রিয়াপদগুলোর রূপান্তর ঘটিয়ে ও জায়গায় জায়গায় দু'একটা শব্দ বসিয়ে হুবহু তুলে দিচ্ছি—বিপিন বাবু লিখ্‌ছেন যে—

"চৈতন্যদেব স্পষ্টভাবে ভগবান ভাষ্যকারের বিবর্ত্তবাদ খণ্ডন করে' পরিণামবাদ স্থাপন করেন। এই পরিণামবাদে জগৎ ও জীবকে পরিণামী নিত্য বলে' প্রতিষ্ঠা করা হ'ল। অথচ মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ও সংসার-জীবনে এই মারাত্মক মায়ার হাত থেকে এড়িয়ে যেতে পার্‌লেন না। লোকে বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষা নিল, বৈষ্ণব-গুরু কর্‌ল, বৈষ্ণব-শাস্ত্র পড়্‌ল; কিন্তু এই জগৎকে ও জগতের বিবিধ সম্বন্ধকে সত্যবোধে ধর্ম্মের প্রেরণায়, মুক্তি কামনায়, পরমার্থ দৃষ্টিতে দেখে আঁকড়িয়ে ধর্‌তে পারল না। এরা ভগবান মান্‌ল; ভগবতীলীলার কথা কইতে লাগ্‌ল; ক্ষণজন্মা সাধু মহাজনেরা ভগবতী-তনু লাভ করে' ইহজীবনে ও ইহলোকেই সেই নিত্য ভগবতীলীলার অনুসরণ কর্‌তে পারেন এও বিশ্বাস কর্‌ল; কিন্তু তবু এই সংসারের প্রত্যক্ষ সেবার প্রেমের রসের সম্বন্ধের মধ্যেই যে দেশকালের রঙ্গমঞ্চে ভগবানের নিত্যলীলার নিত্য অভিনয় হচ্ছে * * * * এ সব কথা ধর্‌তে ও বুঝ্‌তে পার্‌ল না।"

তারা আবার ঘুরে ফিরে "মায়াবাদী বৈদান্তিক যে ভাবে এই

সংসারকে মায়িক বা অলীক বলে' উপেক্ষা করে' আস্‌ছিলেন" ঠিক তেমনি কর্‌তে লাগ্‌ল।

এই কি একটা মস্ত প্রমাণ নয় যে সত্য কাউকে হজম করিয়ে দেওয়ার শক্তি মহাপুরুষেরও নেই, যদি না তা'র সে সত্যকে হজম কর্‌বার শক্তি থাকে? যে সত্য মানুষের অন্তরে সত্য হ'য়ে না উঠেছে সে সত্য তা'র বাহিরে ব্যর্থ হবেই? কিন্তু বিপিন বাবু বল্‌ছেন যে রাষ্ট্রীয়-জীবনে তখন আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ একরূপ বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল বলেই অন্তরের ঐ সত্য বাহিরে আপনাকে সার্থক করে' তুল্‌তে পারে নি। সত্যের এক নূতন মূর্ত্তি বটে! যে সত্য শত সহস্র বাধা বিঘ্ন ভেঙে শত সহস্র বিপদ আপদের মাঝ দিয়ে আপনাকে প্রতিষ্ঠা কর্‌তে না পারে সে সত্য কেমন সত্য? যে সত্য কাজীর ভয়েই মূর্চ্ছা যায় সে সত্য কেমন সত্য? সত্যকে কি আমরা এই রকম বলেই জানি! মানুষের রক্ত মাংস ত্বকের চাইতে —মানুষের জীবনের চাইতে যে মানুষের সত্য বড়—এটা ত জগতের শত সহস্র সত্যসন্ধ লোকের জীবনে কত শতবার প্রমাণ হ'য়ে গিয়েছে। অথচ বিপিন বাবু বল্‌ছেন যে বৈষ্ণবদের ভিতরের সত্য বাহিরের চাপে আর ফোটারই সুযোগ পেলে না। আসল কথাটা কি এই নয় যে—বৈষ্ণবদের অন্তরে চৈতন্যদেবের শিক্ষা সত্য হ'য়ে উঠ্‌লে বাহিরের চাপে সেটা আরও দীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ত, সুপ্ত হ'য়ে পড়্‌ত না কিছুতেই। সত্য কথা এই যে চৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে পরিণামবাদের যে শিক্ষাই দিন না কেন তা তাঁদের অন্তরে সত্য হ'য়ে ওঠে নি—সে শিক্ষার মন্ত্র মুখে আওড়ালেও

অন্তরে তাঁরা সেই শঙ্করের মায়াবাদেরই জের টেনে চলেছিলেন। কাজীর চাপ একটা excuse মাত্র—এই excuseকে নিমিত্ত করে' যেটা ছিল তাঁদের পক্ষে আসল সত্য, মায়াবাদ, সেইটেই তাঁদের জীবনটাকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। এই excuse-এর উদাহরণ ইতিহাসে ভূরি ভূরি মেলে। যেমন সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড গত ইয়োরোপীয় সমরের একটা excuse.

বিপিন বাবু রাষ্ট্রীয়-জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথের কথা তুলেছেন—কিন্তু ভিতরের পথ সত্য হ'য়ে না উঠ্‌লে যে বাহিরের পথ অপথই থেকে যায় তা'র উদাহরণ আছে সিরাজদ্দৌলার ইতিহাসে। রাষ্ট্রীয়-জীবনের ত তখন আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ দিব্যি পরিষ্কার হয়েছিল—কিন্তু হিন্দুরা সে পথ ধরে' চল্‌ল না কেন? কারণ হিন্দুদের অন্তরে আত্মপ্রতিষ্ঠা সত্য হয় নি বলে'। কিন্তু বিপিন বাবুর সিদ্ধান্ত অনুসারে অবশ্য ইংরাজই সব মাটি করেছে—ইংরাজ না থাক্‌লে নিশ্চয়ই হিন্দুরা আপনার অধিকার পেয়ে যেত। এ হচ্ছে সেই ছেলের মত কথা যে বাপকে এসে বলেছিল—"বাবা আমি পরীক্ষায় সেকেণ্ড হয়েছি।" ছেলের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্বন্ধে পিতার চিরদিনই একটু সন্দেহ ছিল তাই জিজ্ঞেস করলেন—"ক্লাসে ছেলে ক'জন রে?" ছেলে প্রসন্নমুখে উত্তর দিল—"দু'জন।" কিন্তু সত্যকথা এই নয় কি যে ইংরেজ না থাক্‌লে বাংলার মসনদ অধিকার করে' বস্‌ত ফরাসীরা,—ফরাসীরা না হ'লে পর্ত্তুগীজরা, পর্ত্তুগীজ না হ'লে দিনেমার ওলন্দাজ আলেমান, যে হোক্ আর কেউ, বস্‌ত না কিছুতেই যারা, সে হচ্ছে উমিচাঁদ, রাজবল্লভ কিম্বা কৃষ্ণচন্দ্র।

বিপিন বাবু বল্‌ছেন যে করাসী-বিপ্লবের পর যখন রাষ্ট্রে গণতন্ত্রতার প্রভাব বৃদ্ধি হ'ল তখন থেকে ইয়োরোপে জীবনের সকল ক্ষেত্রে মানুষ মানুষ হ'য়ে ওঠ্‌বার চেষ্টা করতে আরম্ভ করেছে। একেই ইংরেজীতে বলে—Putting the cart before the horse, আসল কথা হচ্ছে যে মানুষ কতকটা অন্তরে মানুষ হ'য়ে উঠেছিল বলেই, মানবসভ্যতার নবযুগ ইয়োরোপের মনে আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলেই, পরে তা ইয়োরোপের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। "Liberté, egalité, fraternité" সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার মন্ত্র ফরাসীজাতির অন্তরে সত্য হ'য়ে উঠেছিল বলে'—এ মন্ত্রের বলে এ সত্যের পরিপন্থী অভিজাতবর্গ ও পুরোহিতসম্প্রদায় ভেসে গেল। এই হচ্ছে ও-ব্যাপারের আসল psychology—অন্ততঃ আমার ত সেইরকমই মনে হয়। কারণ আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে আত্মাটাই মানুষের দেহটাকে গড়ে' তুলেছে। আর আজ এই Capital ও Labour-এর মারামারির দিনে এই সত্যটা মনে রাখা ভাল। বিশেষতঃ যখন বীজ আগে না বৃক্ষ আগে—ডিম আগে না মুরগী আগে—গৌড়ীয় ভাষার "পাত্রাধার তৈল কিম্বা তৈলাধার পাত্র"—এ তর্কের শেষ এ জগতে কোন দিন হবার আশা নেই।

৩

প্রকৃত ঘটনা এই যে, বুদ্ধিমানের কর্ম্মে আর শক্তিমানের ধর্ম্মে একটা আকাশ পাতাল প্রভেদ আছে। এদের দুজনের চলার

ভঙ্গীই আলাদা। বুদ্ধিমান চলে পিঠ বেঁকিয়ে—আর শক্তিমান চলে বুক ফুলিয়ে। তা'র কারণ হচ্ছে এই যে এই দু'জন এ জগতটাকে দেখে দুরকম। দু'জন ত একই জগতে বাস করছে। তারপর যদি কেউ বুদ্ধিমান আর শক্তিমানের চোখ পরীক্ষা করে' দেখেন তবে দেখতে পাবেন যে তাদের দু'জনের চোখ এক রকম উপাদান দিয়েই তৈরী। এ সত্ত্বেও দু'জন একই জিনিসকে দু'রকম দেখে কেন? কারণ তাদের দু'জনের মন দু'রকম। অর্থাৎ তাদের ভিতরটা এক নয় বলে'। আর বাহিরটা ভিতরটারই প্রতিবিম্ব—অর্থাৎ Reflection.

বুদ্ধিমান মনে করে যে সে যে বেঁচে আছে সেটা কেবল তা'র বুদ্ধির জোরে, নইলে আকাশের মঘা থেকে আরম্ভ করে' দেয়ালের টিকটিকীটা পর্য্যন্ত ত তা'কে মারবার ফন্দিতেই ফিরছে! তাই তা'র সারা জীবনটা মরণটাকে ফাঁকি দেবার ফিকির করতেই কেটে যায়। আর শক্তিমান মনে করে যে একবার যখন সে জন্মেছে তখন বেঁচে থাকাটা তার হক্ Birth-right, আর বলে যে—যদ্দিন বেঁচে আছি তদ্দিন পৃথিবীটাকে কসে' বুঝিয়ে দেব যে বেঁচে আছি। শক্তিমান বলে—মঘা টিকটিকী আমাকে মারতে পারে কিন্তু আমাকে ছোট করতে পারে না। তাই শক্তিমান সহস্রবার মরতে রাজি কিন্তু একটী বারও ছোট হ'তে রাজি নয়।

তাই বুদ্ধিমানের নৌকো যখন ডুবল তখন সে প্রচুর গবেষণা করে' বের করলে যে মঘা-নক্ষত্রে নৌকো ছাড়া হয়েছিল বলেই তা'র নৌকো ডুবল। তারপর থেকে সে নৌকো ছাড়তে লাগল

মঘাকে পেরিয়ে। শক্তিমান বল্‌লে যে—মঘা যদি আমার নৌকো ডুবিয়ে থাকে তবে এমন নৌকো তৈরী করব যে অন্ততঃ চারশ' মঘার দরকার হবে সে নৌকোকে ডোবাতে। তাই বুদ্ধিমানের নৌকো আজও পাল তুলেই আর গুণ টেনেই চল্‌ছে—কিন্তু শক্তিমানের নৌকো আজ যা দাঁড়িয়েছে তা'র সঙ্গে তা'র পিতৃপিতামহের নৌকোর প্রকারগত সাদৃশ্য থাক্‌লেও আকারগত সাদৃশ্যও নেই আচারগত সাদৃশ্যও নেই।

যখন প্রথম এরোপ্লেন নিয়ে experiment আরম্ভ হয় তখন ফ্রান্সে যে সেই ব্যাপারে কত লোক মরেছে তা'র ঠিক নেই। কেউ বা দু'শ হাত কেউ বা চার শ' হাত—কেউ বা হাজার ফিট দু'হাজার ফিট চার হাজার ফিট ওঠে তারপর এঞ্জিন খারাপ হ'য়ে যায়—সঙ্গে সঙ্গে এরোপ্লেন সমেত মানুষ ধরাশায়ী—তারপর মৃত্যু—বিশ্রী রকমের সে মৃত্যু! ফ্রান্স যদি অতিরিক্ত পরিমাণে বুদ্ধিমানের দেশ হ'ত তবে ঐ রকমের দু'এক জনের মৃত্যুর পর নিশ্চয় এরোপ্লেনকে নিজের পাততাড়ি গুটিয়ে অন্যত্র যাবার চেষ্টা দেখ্‌তে হত। সঙ্গে সঙ্গে এমন শ্লোকও রচনা হ'য়ে যেত, যাতে স্পষ্ট করে' লেখা থাক্‌ত যে আকাশে ওঠাটা অধ্যাত্মিক জীবন লাভের পরিপন্থী—এবং সঙ্গে সঙ্গে তা'র এমন ভাষ্যকারেরও আমদানী হ'ত, যিনি স্পষ্টতর করে' বলে' দিতেন যে ঐ শ্লোকের অর্থই হচ্ছে এই যে যে-কেউ আকাশে উঠ্‌বে তা'র ঊর্দ্ধতন সাড়ে সাতাত্তর পুরুষের গতি হবে রৌরবে—আর বুদ্ধিমান স্পষ্টতম করে' দেখ্‌তে পেত যে তাদের মতো বুদ্ধিমান আর দুনিয়ায় দুটী নেই। কেবল তা'ই নয়। কেউ কেউ আবার

যৌগিক বলে সূক্ষ্মদৃষ্টি লাভ করে' এ পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পেত যে আকাশে একটা প্রকাণ্ড দৈত্য বসে' রয়েছে, যে-কেউ আকাশে উঠ্‌বে তা'র ঘাড় মট্‌কাবার জন্যে। আর তারপর যদি ঐ উপরিউক্ত শ্লোকটা অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত হয়—তবে ত পোয়াবারো। বুদ্ধিমান তখন পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে দিব্যি আরামে ঐ শ্লোক আওড়িয়ে সেই বিরাট দৈত্যকে একটা ভরাট নৈবেদ্য দিয়ে পূজা কর্‌তে লেগে যেত। আর সঙ্গে সঙ্গে ভাব্‌ত যে এ পৃথিবীতে সূক্ষ্মদৃষ্টিটা তাদের কপালেই খালি মিলেছে।

কিন্তু ফ্রান্স শক্তিমানের দেশ। তা'রা দু'দশ জনের মরণটাকে কেয়ারই কর্‌লে না। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল যে যত দিন যেতে লাগ্‌ল সেই দৈত্যটার মানুষের ঘাড় মট্‌কাবার ক্ষমতাটা তত কমে আস্‌তে লাগ্‌ল। অবশেষে যখন শ'চার পাঁচেক মানুষের জীবন দিয়ে এরোপ্লেন্‌টার পূর্ণ প্রাণ প্রতিষ্ঠা হ'য়ে গেল তখন দৈত্যটাও একেবারে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। চার শ' ফরাসী ম'রে চার কোটি ফরাসীকে বাঁচিয়ে গেল। মানুষ মর্‌ল বটে কিন্তু মনুষ্যত্ব বেঁচে গেল।

এখন বুদ্ধিমানের হাজার সূক্ষ্মদৃষ্টি সত্ত্বেও যে জিনিসটা সে কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারে না সেটা হচ্ছে এই যে, ঐ যে চার পাঁচ শ' লোক মর্‌ল ওরা ও-রকম গোঁয়ার্ত্তুমি করে' মর্‌তে গেল কেন? তা'তে তাদের কি লাভ? উত্তরমেরু আবিষ্কার নাই বা হ'ল?—তা'র আসল কেন্দ্রটা জ্যামিতিক ম্যাপের হিসেবে ঠিক নাই বা জান্‌লেম—তা'তে ক্ষতিটা কি? এ কি রকম মানুষের আজগুবি সখ! এই যে বুদ্ধিমান শক্তিমানকে বুঝ্‌তে পারে না

তা'র কারণ হচ্ছে যে তাদের দু'জনের অন্তর এক নয়। শক্তিমান নিজের অন্তরে যে প্রাণের স্পন্দন অদম্য বেগে পাচ্ছে, বুদ্ধিমান তা পাচ্ছে না। অন্তরের এই পার্থক্যের জন্যই তাদের বাহিরেও কর্ম্মের এই পার্থক্য দাঁড়িয়ে যায়। কারণ মানুষের বাহিরের কর্ম্ম তা'র অন্তরের ধর্ম্মেরই অনুবাদ—অর্থাৎ translation.

বুদ্ধিমান ও শক্তিমানের অন্তরে এই যে পার্থক্য—এ পার্থক্যের আসল নিগূঢ়তম কারণটা কি ? এ সম্বন্ধে যা বুঝি সেটা বল্‌ছি।

৪

সৎ, চিৎ, আনন্দ—এটা হচ্ছে মানুষের কথা। ভগবান যদি দর্শন লিখ্‌তে বসে' যেতেন তবে তিনি ঐ ফরমূলাকে উল্‌টে দিয়ে লিখ্‌তেন—আনন্দ, চিৎ, সৎ। কারণ গোড়ার কথা আনন্দ—তারপর শক্তি—তারপর সৃষ্টি। আনন্দ থেকে প্রকাশ হয়েছে শক্তি—শক্তি থেকে উদ্ভূত হয়েছে সৃষ্টি। এই হচ্ছে সৃজনলীলার মূলতত্ত্ব। আর মানুষের জীবনেও এই তত্ত্বই কার্য্যকারী হ'য়ে রয়েছে। শক্তিমান ও বুদ্ধিমানের নিগূঢ়তম প্রভেদটা হচ্ছে ঐ আনন্দ নিয়ে। শক্তিমানের অন্তরে আনন্দ আছে—বুদ্ধিমানের তা নেই। অন্তরে ঐ আনন্দ আছে বলে' শক্তিমান তা'র বেঁচে থাকার মধ্যে অমৃত পায়। বুদ্ধিমানের ঐ আনন্দ নেই বলে' সে তা'র বেঁচে থাকার মধ্যে খুঁজে বেড়ায় আরাম। এই যে জীবনের আনন্দ—বেঁচে থাকার আনন্দ—এই আনন্দের রীতিই হচ্ছে গতিতে

—বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে—রূপ থেকে রূপান্তরে—রস থেকে রসান্তরে—এক কথায় এই আনন্দের ধর্ম্ম হচ্ছে Multiplication—Subtraction নয়। সেই জন্যে এই আনন্দ প্রাণে প্রাণে অন্তরে অন্তরে অনুভব করে' শক্তিমানের যে মানসিক ভাব দাঁড়ায় সেটা বাংলায় তর্জ্জমা করলে কতকটা দাঁড়ায় এই রকম—

সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই !
বাধা বাধন নেই গো নেই।
দেখি, খুঁজি, বুঝি,
কেবল ভাঙি, গড়ি, যুঝি,
মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব সাজেই।
পারি, নাই বা পারি,
না হয় জিতি কিম্বা হারি,
যদি অমনিতে হাল ছাড়ি মরি সেই লাজেই।
আপন হাতের জোরে
আমরা তুলি সৃজন করে,
আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাঁধি, থাকি তার মাঝেই।

এই যে, দেখা, খোঁজা—তা'তে শক্তিমান যাই পাক্, এই যে ভাঙা গড়া তা'তে শক্তিমান যাই গড়ে' তুলুক—তাইই তা'কে সার্থকতা মিলিয়ে দেয়—কারণ জিনিসের সার্থকতা ত জিনিসের মধ্যে নেই আছে তা মানুষের অন্তরে। বেঁচে থাকার এই আনন্দের জন্যই শক্তিমান উত্তরমেরু আবিষ্কার করতে ছোটে—এমন কি, নিশ্চিত মরণও তা'কে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। কারণ

আনন্দ যেখানে আছে মরণও সেখানে অমৃতময় হ'য়ে ওঠে। ঠিক এই কারণেই ইয়োরোপ অদম্য ভোগের স্রোতে আপনাকে ভাসিয়ে দিয়েও মরতে ভয় পায় না—কিন্তু আমরা জীবনটা নশ্বর নশ্বর করে' কাটিয়েও টিক্‌টিকিটীকে পর্য্যন্ত সমিহ করে' চলি। অন্তরে এই আনন্দ আছে বলে' শক্তিমান এরোপ্লেন নিয়ে আকাশে ওঠে। তা সে মরুক আর বাঁচুকই। এই যে সে এরোপ্লেনে ওঠে সেটা সে কর্ত্তব্য বোধে করে না—তা'র জাতীয় জীবনের পক্ষে শ্রেয় বলে' করে না। ও-সব হচ্ছে পাটোয়ারী বুদ্ধির লাভ ক্ষতির হিসেব। লাভ ক্ষতি একটা accident মাত্র। আসল কথা হচ্ছে তা'র অন্তরের ঐ আনন্দ। কর্ত্তব্য-বোধে শ্রেয় জ্ঞানে মানুষ যা করে তা সে দু'দিন করতে পারে, কিন্তু চিরকাল পারে না। কারণ যেখানে শুধু কর্ত্তব্য সেখানে কেবল দাসত্ব। যতদিন না শ্রেয়টা মানুষের জীবনে প্রেয় হ'য়ে উঠেছে, যতদিন না মানুষের কর্ত্তব্য তা'র অন্তরের আনন্দ নিয়ে অমৃতময় হ'য়ে উঠেছে—ততদিন মানুষের জীবন ব্যর্থই হবে—তা'র ভিতরেও বাহিরেও। এই জন্যই বুদ্ধিমান শক্তিমানের উত্তরমেরু আবিষ্কার বুঝ্‌তে পারে না। তার "গৌয়ার্ত্তুমি" "আজ্‌গুবি সখের" মানে অভিধান খুলেও পায় না—পঞ্জিকা খুঁজেও পায় না।

এই যে আনন্দ—এটা মানুষের অতি সহজলভ্য। তেমনি সহজ-লভ্য যেমন সহজলভ্য তা'র নিশ্বাস নেবার বাতাস। ভগবানের সঙ্গে মানুষের সর্ত্তই হচ্ছে এই যে, সে ভগবানের জগত-লীলায় সঙ্গী হ'য়ে থাক্‌বে যদি ভগবান তা'র অন্তরের জীবন-দেবতাকে আনন্দময়

করে' রাখে। মানুষ যখন তা'র এই অন্তরের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয় তখন ভগবানকে সে নোটিশ দেয়—বলে—ভগবান চল্লেম আমি তোমার এই জগৎ থেকে। তখন সে মায়াবাদ প্রচার করতে লেগে যায়—নির্ব্বাণ মুক্তির পথ খুঁজে বেড়ায়। কেউ কেউ আবার কতগুলো অস্বাভাবিক প্রক্রিয়াদ্বারা এই আনন্দকে ধরতে চায়। এই অস্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলোরই আমরা নাম দিয়েছি—হঠযোগ, রাজ-যোগ ইত্যাদি। কিন্তু কথা হচ্ছে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের জোরে ফূর্ত্তি করে' বেড়ান এক কথা আর বোতল বোতল "এসেন্স অফ নিম" খেয়ে স্বাস্থ্য রক্ষা আর-এক কথা।

এই হচ্ছে বুদ্ধিমান ও শক্তিমানের অন্তরের পার্থক্যের নিগূঢ়তম কারণ। শক্তিমানের জীবনে বেঁচে থাকার যে স্বাভাবিক সহজলভ্য আনন্দ তা আছে—বুদ্ধিমানের তা'র অভাব। ঐ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হ'য়ে বুদ্ধিমান বুদ্ধিমান হয়েছে—আর ঐ আনন্দকে বুকে করে' শক্তিমান শক্তিমান। বলা বাহুল্য আমরা এই বুদ্ধিমানের দলের লোক—আর বর্ত্তমান ইয়োরোপ শক্তিমান লোকের দেশ।

৫

এখন আমাদের এই গোড়া থেকে আরম্ভ করতে হবে, আগা থেকে নয়। কারণ কেউ কোনকালে ছাদ থেকে আরম্ভ করে' কোন ইমারত খাড়া করে' তুলেছে এ-খবর কোন দেশের বা কোন জাতির ইতিহাসেই আমরা পাই নি। যতদিন না আমাদের জীবন-

দেবতার মন্দিরে বেঁচে থাকার আনন্দ প্রতিষ্ঠা হ'য়ে উঠবে ততদিন আমরা আমাদের বাহিরের কিছুকেই সত্য করে' পাব না—আর যেটাকে সত্য করে' পাব না সেটা আমাদের বোঝা হয়েই উঠ্‌বে। আর আমরা যে যে-কোন বোঝাকে মন্ত্র পড়ে' শূন্য দিয়ে গুণ করে' নির্ব্বাণ পাইয়ে দিতে পারি তা'র প্রমাণ আমাদের জাতীয় জীবনের "সুপ্রাচীন দার্শনিক যুগে"র দর্শনের পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করে' লেখা আছে।

তাই প্রথমে আমাদের মানুষকে গড়ে' তুল্‌তে হবে। মানুষের মন তৈরী করতে হবে—রাজনীতিকে নয়। কারণ মানুষই রাজনীতি গড়ে' তোলে—রাজনীতি মানুষ তৈরী করে না। নইলে ঘটনাক্রমে যদি বা আমরা স্বায়ত্ত-শাসন পেয়েই যাই তবে আমরা সেই গোঁড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতোই করব। হয়ত আমরা দু'দিন বাদে আমাদের ব্যবস্থাপক-সভার মজলিসে খোল কর্‌তাল নিয়ে হরিস কীর্ত্তনের আখড়া খুলে বস্‌ব।

অবশ্য বিপিন বাবু আশ্বাস দিয়েছিলেন যে হিন্দুর যখন নৌবাহিনী গড়ে' উঠ্‌বে তখন আর সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হ'য়ে থাক্‌বে না। যেন সমুদ্রযাত্রাটা কেবল জলযুদ্ধ করবার জন্যেই দরকার—যেন এর আর কোন প্রয়োজন নেই। উপরন্তু যেটা নিষ্প্রয়োজনে করবার হুকুম নেই—মানুষ চিরজীবন ভরে' যেটা এড়িয়ে চলেছে—সেটা যে এক-দিন সে প্রয়োজনের তাগিদে এক লাফে করে' ফেল্‌বে—তা খালি রূপকথার দেশেই সম্ভব—রক্তমাংসের দেশেও সম্ভব নয়—জ্ঞান-বিজ্ঞানের দেশেত নয়ই। কিন্তু যা হোক্ এখনও বাংলার সুদূর পল্লীতে পল্লীতে এমন অনেক গোঁড়া হিন্দু আছেন যাঁদের অন্তর

বিপিন বাবুর ঐ আশ্বাস-বাণী শুনে চম্‌কে উঠ্‌বে। তাঁদের সান্ত্বনার জন্যে বল্‌ছি যে তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকুন। যতদিন সমুদ্রযাত্রার নাম শুনে তাঁদের অন্তর এমনি চম্‌কে উঠ্‌বে ততদিন হিন্দুর নৌবাহিনী গড়ে' ওঠ্‌বার কোন সম্ভাবনারও সম্ভাবনা নেই। আর যদি বা জন কয়েক স্বধর্ম্মদ্রোহী স্বেচ্ছাচারী কাণ্ডজ্ঞানহীনের বিশ্বাসঘাতকতায় কোন নৌ-বাহিনী সত্য-সত্যই গড়ে' ওঠে তবে সে জন কয়েকের ছাপ্পান্ন পুরুষের সাধ্য হবে না যে তাঁদের মধ্যে কাউকে সেই নৌ-বাহিনীর এ্যাড্‌মিরালের পদে অভিষিক্ত করে।

একটি প্রেমের গান

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়,
সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু
শ্রুতি পথে পরশ না গেল ॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়িনু
না বুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি ॥
কত বিদগধ জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক ॥

এই হচ্ছে গানটা। কিন্তু "লাখে না মিলল এক"—তাই এমন গান বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসে ঐ একটির দর্শন পেলেম।

২

"তিলে তিলে নূতন হোয়।" তাই ত এ লাখ লাখ যুগেও এ প্রেমের হ্রাস নেই—এ যে তিলে তিলে প্রতি পলে পলে নতুন কর্‌ছে —নতুন হচ্ছে—মরচে ধর্‌বার অবসরই নেই এতে—স্বাদহীন হবার সম্ভাবনাই নেই এতে। যেখানে পুরাতন সেখানেই মানুষের অশ্রদ্ধা —যা পুরাতন তাই যে মানুষ অত্যন্ত করে' জানে, নিঃশেষ করে' জানে। যেখানে মানুষ নিঃশেষ করে' জানে সেখানে মানুষের আর চল্‌বার পথ নেই—আকাঙ্ক্ষা সেখানে বেদনাময়—চেষ্টা সেখানে ক্লান্তিজনক অর্থহীন। সেখানে আছে শুধু আরামের বোঝা— আনন্দের অবদান সেখানে নেই। আর আরামের বোঝা সুস্থ ও প্রাণবান মানুষের পক্ষে ঘোর অধর্ম্ম। তাই মানুষের প্রেমের লাখ লাখ যুগেও হ্রাস হবে না—লাখ লাখ যুগেও হৃদয়ে হৃদয় রেখে যে প্রেম স্বাদহীন হবে না—সে-প্রেম সম্বন্ধে প্রথম ও প্রধান সর্ত্ত হচ্ছে যে, সে-প্রেম যেন তিলে তিলে নূতন করে—সে-প্রেম যেন "তিলে তিলে নূতন হোয়"। তিলে তিলে যদি তা নতুন হ'য়ে না ওঠে তবে আজ যাকে কেঁপে হিয়ায় রাখ্‌ছি কাল তা'কে ডেকে বিদায় দেব। কারণ জীবনের খেলাই হচ্ছে নতুনের খেলা।

"তিলে তিলে নূতন হোয়"। জীবনের খেলাই হচ্ছে ওই— "তিলে তিলে নূতন হোয়"। কত লক্ষ বৎসর মানুষ বেঁচে আছে— কিন্তু তবুও সে আপনার কাছে আপনি বোঝা হ'য়ে উঠ্‌ল না— আপনার কাছে আপনি গলগ্রহের মতো হ'য়ে উঠ্‌ল না—কারণ সে

যে "তিলে তিলে নূতন হোয়"। সে তিলে তিলে নূতন হ'য়ে উঠ্‌ছে, তাই তা'র আপনার সম্বন্ধে আপনার কৌতুহলের শেষ নেই—অজ্ঞাত যা, গুপ্ত যা, সুপ্ত যা, তা দিনে দিনে বিকশিত হ'য়ে তা'র চোখের সাম্‌নে মনের সাম্‌নে ফুটে উঠ্‌ছে; তাই তা'র ক্লান্তি নেই, ঔদাসীন্য নেই, বৈরাগ্য নেই। জীবনে যখন এই নতুনকে ঠেকিয়ে রাখ্‌ব তখনই জীবনের মরণকেও ডেকে আন্‌ব। কারণ মানুষের প্রতি-পলের মরণই তা'র প্রতি দিনের জীবনকে গড়ে' তুল্‌ছে।

তিলে তিলে পলে পলে মানুষ নতুনকে পাচ্ছে বলে' এ জগতের রং তা'র চোখে আজও ফিঁকে হ'ল না। বাহিরের জগত হয়ত হাজার বছর সেই একই আছে—সেই বর্ষায় ঘন দেয়ার গুরু গুরু ডাক—কালো মেঘের জিলিক হানাহানি—পাগল বাদলের উতোল ধারা; সেই শরতের চোখ-গলানো মন-মাতানো জ্যোৎস্না; সেই বসন্তের সবুজ বনের অবুঝ হাওয়ার মাতামাতি; সেই শীতের রহস্য-ময় কুজ্ঝটিকা ঘেরা যেন স্বপ্নের জগত—হয়ত সেই সবই এক—কিন্তু মানুষ পুরাতনকে ত্যাগ করে', তা'র উপরে বিস্মৃতির তুলি বুলিয়ে তা'র অন্তরের জগতে প্রতি নিমেষে নতুনের জন্যে আসন পাত্‌ছে। তা'র ভয় কি জানি যদি কোন কিছুকেই আবার সে নতুন করে' না পায়—কি জানি যদি পুরাতন তা'র গুরু গম্ভীর অতিমাত্র চেনা মুখ নিয়ে হাজির হয়। সে চেনার মধ্যে যে চাইবার কিছু নেই—খুঁজ্‌বার কিছু নেই—বুঝ্‌বার কিছু নেই—তা'র পিছনে যে একটা মস্ত কালো দাঁড়ি সমাপ্তির শেষ টেনে বসে' আছে। আর সমাপ্তিকে নিয়ে ত মানুষ বাঁচ্‌তে পারে না—সমাপ্তি থাক্‌লে যে মানুষের সমস্ত

প্রকৃতি তা'র মন বুদ্ধি চিত্ত, তা'র কর্ম্ম-প্রেরণা ভোগ-প্রেরণা সব ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। তাই মানুষের জীবনেরও ঐ সত্য—তা "তিলে তিলে নূতন হোয়"। জীবন্মৃত যে তা'র অন্তরেই নূতনের জন্যে আসন পাতা নেই—আর নূতনকে বরণ করে' নিতে নারাজ যে তারই মরণ।

"তিলে তিলে নূতন হোয়"। তাই জীবন এত মধুর—এত রসযুক্ত।

"আজ আমাদের সাধের বৃন্দাবন
নিত্য নূতন নূতন।"

এই যে জীবন-বৃন্দাবন তা নিত্য নূতন নূতন। নিত্য নূতন মুকুট মাথায় দিয়ে জীবন-দেবতা নিত্য নব রসে অভিষিক্ত হ'য়ে নিত্য নূতন পথে চল্‌ছেন। তাইত দেখি মানুষ অনন্ত—বাইরের রক্ত মাংস তা'র মনের পাতায় দাঁড়ি টানে নি। বাহিরকে সে অন্তরের অনন্ত রহস্যে মণ্ডিত করে' নিত্য নূতনের খেলা খেল্‌ছে। তাই এই বাহিরের জগৎ তা'র অন্তরের রঙে "তিলে তিলে নূতন হোয়"।

নতুন যেখানে আপনার পথ পায় নি—যেখানে সে অবজ্ঞাত হয়েছে—মানুষের মনে প্রাণে যেখানে সে ভয় বা তাচ্ছিল্য জাগিয়ে গিয়েছে—সেই খানেই পুরাতন ধীরে ধীরে মানুষকে জড়ে পরিণত করে' অমৃতের কাছ থেকে তা'কে দূরে—অতিদূরে টেনে নিয়ে গেছে। মানুষের জীবনে অনন্ত সম্ভাবনার পথ সেখানে রুদ্ধ। সেখানে মানুষের আত্মার চাইতে মন—মনের চাইতে দেহের রক্ত

মাংস বড় হ'য়ে উঠে ধীরে ধীরে তা'কে মাটির দিকে টেনে নিয়ে গেছে—মাটিতে শিকড় গেড়ে তা'কে উদ্ভিদে পরিণত করেছে—উদ্ভিদ ধীরে ধীরে পাথরে পরিণতি লাভ করেছে। নূতনের মধ্যে রয়েছে গতি—তাই সেখানে রয়েছে মানুষের কল্যাণ। তাই মানুষের জীবনের একটা বড় সত্য হচ্ছে ঐ—যে তা "তিলে তিলে নূতন হোয়"।

৩

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

জন্ম ভরে' রূপ দেখ্‌লুম তবু নয়নের তৃপ্তি হ'ল না—নয়নের বৈরাগ্য এলো না। কারণ আমি যে সে-রূপ দেখে তিলে তিলে নতুন হচ্ছি—কারণ সে-রূপ যে আমার চোখে তিলে তিলে নতুন হ'য়ে উঠ্‌ছে।

কি এ রূপ? কিসের এ রূপ? যা দেখে জন্ম জন্মান্তরেও আশ মিট্‌ল না—জন্ম জন্মান্তরেও আশ মিট্‌বে না। এ রূপ কি শুধু ঐ মুখের? তা'র সুবিন্যস্ত পেশীসমূহের? নিটোল সুগোল গণ্ডের? নির্ভুল পরিমিত রেখাবন্ধনীর? শ্যাম দূর্ব্বাদলসন্নিভ বা চম্পক-বিনিন্দিত বর্ণের? বনস্পতি সদৃশ উন্নত ঋজু দেহযষ্টি বা ললিত-লবঙ্গলতাতুল্য লীলায়িত দেহলতার?—না। তা যদি হ'ত তবে তা নিষ্ঠুর তৃপ্তি এনে সমাপ্তির গান গাইত। না, এরূপ আমি সাদা চোখে খালি মুখেই দেখি নি—চোখের পিছনে যে মন আছে সেই

মন দিয়ে দেখেছি—মনের পিছনে যে আত্মা আছে সেই আত্মা দিয়ে স্পর্শ করেছি—তাই এ রূপের নশ্বরতা নেই—তাই এ রাগের মাদকতার বিরতি নেই। ঐ বাইরের রূপের পিছনে, বাইরের রূপের অন্তরে, বাইরের রূপকে ডুবিয়ে ছাপিয়ে যে একটা অনির্ব্বচনীয়তা আছে—আমার অন্তরের অনির্ব্বচনীয়তার সঙ্গে সেই অরির্ব্বচনীয়তার যোগ হয়েছে, তাই ও রূপের সৌন্দর্য্য জন্ম জন্মান্তরেও আমার কাছে মলিন হ'ল না—তাই ওর নেশা আমার লেগেই রইল—তাই

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি।"

এ রূপ যদি কেবল রক্ত মাংসের রূপ হ'ত, তবে হিয়ার স্পন্দন থেমে গিয়ে ছ'দিনে ক্রন্দন উঠ্‌ত।

কবি লিখ্‌ছেন—"যেখানে পদ্মফুলের নির্ব্বচনীয়তা সেখানে তা'র আকার আয়তন ও বস্তুপরিমাণ সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ ভাবে তা'র আপনারই। কিন্তু যেখানে পদ্মটি অনির্ব্বচনীয় সেখানে সে যেন আপনার সমস্তটার চেয়েও আপনি অনেক বেশী। * * *। পদ্মের যেখানে এই বেশী সেখানে তা'র সঙ্গে আমার বেশীরও একটা গভীর মিল। তাই ত গাহিতে পারি

কমল-মুকুলদল খুলিল!
দুলিল রে দুলিল
মানস-সরসে রসপুলকে
পলকে পলকে ঢেউ তুলিল!

একটি প্রেমের গান

গগন মগন হ'ল গন্ধে,
সমীরণ মূর্চ্ছে আনন্দে ;
গুন্ গুন্ গুঞ্জন ছন্দে
মধুকর ঘিরি ঘিরি বন্দে ;
নিখিল ভুবন মন ভুলিল
মন ভুলিল রে
মন ভুলিল !"

মন কেবল ভুলিলই নয়—মন ভুলেই রইল—লাখ লাখ যুগ ভুলে রইল—জন্ম জন্মান্তর ভুলে রইল। এ কার গুণে ? কিসের গুণে ? —ঐ অনির্ব্বচনীয়তা, যারই কেবল জরা নেই, মৃত্যু নেই, আদি নেই, অন্ত নেই। এ অনির্ব্বচনীয়তা বচনে বল্‌তে পারি নে—চেষ্টা করি মাত্র, বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা কর্‌তে পারি নে—দর্শন করি মাত্র, তাই ত—

সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনমু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।

তাই

কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়িনু
না বুঝনু কৈছন কেলি।

এই অনির্ব্বচনীয়তা আমাদের ভুলিয়ে রেখেছে এই জগতে। নইলে কোনদিন মানুষ সব ত্যাগ করে' নির্ব্বচনের জন্যে উৎগ্রীব হ'য়ে উঠ্‌ত—চোখ বুঁজে সব তপস্যায় বসে' যেত—চোখ খুলে আর চাইতই না কোন দিকে। কিন্তু এই অনির্ব্বচনীয়তা তা'কে যুগে

যুগে ঔদাসীন্য থেকে মুক্তি দিচ্ছে—বৈরাগ্য থেকে ফিরিয়ে আন্‌ছে। এই অনির্ব্বচনীয়তাই তা'র জীবনের গভীরতম সত্য, তাই চোখের অশ্রু মনের ব্যথা প্রাণের ব্যর্থতার ভিতর দিয়েও সে বেঁচে এসেছে। কিন্তু এই অন্তরতম অনির্ব্বচনীয়তাকে আমাদের মন জান্‌ছে না, বুদ্ধি বুঝ্‌ছে না। এই অনির্ব্বচনীয়তাকে মনে প্রাণে চিত্তে বুদ্ধিতে মানুষের সমস্ত প্রকৃতিতে সত্য করে' তোলা—জাগ্রত করে' তোলাই হচ্ছে মানুষের আজীবনের সাধনা।

৪

এই অনির্ব্বচনীয়তারই সন্ধান হিন্দু একদিন পেয়েছিল—এই অনির্ব্বচনীয়তার উৎস কোথায় তা টের পেয়েছিল। তাই সেদিন সে বাহির থেকে ভিতরে ফির্‌ল। সেদিন সে খোলা চোখ বন্ধ কর্‌ল—মন বুদ্ধিকে রুদ্ধ কর্‌ল—হাত বাঁধল, পা বাঁধল। সেদিন সে পদ্মাসনে বসে' গেল তপস্যার অনির্ব্বচনীয়তার ঐ উৎসে পৌঁছিতে হবে—তা'তে অবগাহন কর্‌তে হবে—জীবনের গভীরতম সত্যকে জান্‌তে হবে।

বাহিরে তা'র দুর্গতির সীমা রইল না। তা'র স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তি নিলামে চড়্‌ল—তা'র সংসার অশ্রুতে অশ্রুতে সিক্ত হ'ল, হাহাকারে হাহাকারে পূর্ণ হ'ল—কুটীরের দ্বারে তা'র দুর্ভিক্ষ রাক্ষস করাল বদন ব্যাদন করে' তা'কে ভয় দেখাতে লাগ্‌ল—মহামারী প্রেত তা'র যোগাসনের চারিদিকে অট্টহাস্য করে' করে' নাচ্‌তে লাগ্‌ল—কিন্তু হিন্দু টল্‌ল না, যোগীর ধ্যান ভাঙ্‌ল না—রক্তমাংসের

দুঃখ, চোখের অশ্রু, প্রাণের ব্যথা মানুষকে জয় করতে পারল না—ধ্রুবতারার মতো একটি তারা শুধু তা'র ইচ্ছাশক্তির সামনে জ্বল্ জ্বল্ করে' জেগে রইল—ঐ অনির্ব্বচনীয়তাকে জানতে হবে—তা'র উৎসে পৌছোতে হবে—তা'তে অবগাহন করতে সৃষ্টির নিগূঢ়তম সত্যকে আপনার করতে হবে। এমনি হিন্দুর একাগ্রতা, এমনি হিন্দুর শক্তি—এ শক্তি যেদিন বেরিয়ে এসে জগত-লীলায় মাতবে, সেদিন সে হবে অপরাজেয় অরিন্দম।

কিন্তু সকল সত্য অনুষ্ঠান মিথ্যাও কিছু জড়িয়ে আনে—যেমন প্লাবনের জল আবর্জ্জনারাশি কুড়িয়ে আনে। তাই রব উঠ্ল—ঐ শেষ, ঐ অন্তরের অনির্ব্বচনীয়তার উৎসে পৌছা—ঐখানে সমাধি, মহাসমাধি—তারপর অক্ষর ব্রহ্মে নির্ব্বাণ মানবজন্মের চরম সার্থকতা।

কিন্তু ঐ শেষ নয়—অনির্ব্বচনীয়তা শেষ নয়—ওটা যে সৃষ্টির আরম্ভ—মানুষের ওটাই যে প্রারম্ভ। ঐ আরম্ভ থেকে মানুষকে সন্ধানে আরম্ভ করতে হবে। ঐ অনির্ব্বচনীয় উৎসে অবগাহন করে' দেহ মন প্রাণ বুদ্ধিকে 'অমৃতময় করে' হিন্দুকে আবার বেরিয়ে আসতে হবে অমর হ'য়ে শক্তিমান হ'য়ে। সংসারের চোখের অশ্রু মিশিয়ে দিয়ে তা'র মুখের হাসি আবার ফুটিয়ে তুলতে হবে—মহাকালের অনুচরকে দূর করতে হবে—মানুষের সমস্ত প্রকৃতিকে ঐ অনির্ব্বচনীয়তায় অভিষেক করে' সত্য করে' তুলতে হবে—মানুষের ঐ সত্যকে জগতে সার্থক করে' তুলতে হবে। বিশ্ববাসীকে ঐ অনির্ব্বচনীয়তার সংবাদ দিতে হবে—তা'র সন্ধান দিতে হবে।

বিশ্ববাসী যে অনির্ব্বচনীয়তার উৎসে অবগাহন করে' অমর হ'য়ে সজ্ঞানে চোখ মেলে বস্‌বে।

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল—

সে রূপের ব্যাখ্যান করে' করে' সে জন্ম-জন্মান্তর নবীনতা লাভ কর্‌বে—বিশ্ববাসী গৌরবোন্নতশিরে আবার একবার বল্‌বে যে তা'রা হচ্ছে—অমৃতস্য পুত্রাঃ।

'নারীর উক্তি'

দমকা পশ্চিমে হাওয়ার পরে পরেই দেশের বুকে আচমকা যে একটা পূবে বাতাস বইতে সুরু কর্‌ল সেই পূবে বাতাসের মাঝে পেট্রিয়টিজমের প্রকাণ্ড ঠুলি দু'চোখে আচ্ছা করে' কসে' বেঁধে আমরা প্রমাণ করতে বস্‌লেম যে আমাদের যা কিছু তা'র তুল্য জিনিস আর জগতে নেই—তা সে বৈষ্ণব কবিতাই কি, আর ব্রাহ্মণের পৈতাই কি! আমাদের বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখ আর ঘুচ্‌ল না! দমকা পশ্চিমে হাওয়া যেদিন বইল সেদিন চোখ বিস্ফারিত করে' বল্‌লেম—ওঃ কি জোর, কি তোড় হাওয়ার—এমন হাওয়ায় উড়ে যেতে পার্‌লেই জীবন। 'তারপর আচমকা পূবে বাতাস যখন বইতে সুরু কর্‌ল তখন চোখ আরও বিস্ফারিত করে' বল্‌লেম—আঃ কি শান্তি কি স্নিগ্ধতা বাতাসের—এমন বাতাসে মরে' থাক্‌তে পারলেই স্বর্গ। আমাদের মনের ঝুলন আর থাম্‌ল না!

এই রকম যখন অবস্থা তখন যদি দেশে এমন কা'রো পরিচয় পাওয়া যায় যাঁর চোখে পশ্চিমের ঝিলিক্ মারা সভ্যতার চমক

● নারীর উক্তি—শ্রীইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী, ১৯২০

লেগেও মন উদ্‌ভ্রান্ত হয় নি আবার তাঁর মনে পূবের আত্ম-সর্ব্বস্ব বা আত্মা-সর্ব্বস্ব জীবন যাত্রার মোহের প্রলেপ লেগেও চোখ দুটো বুজে যায় নি, তবে যে কেবল আনন্দই হয় তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে এ আশাও মনে জাগে যে আমাদের জাতীয় মুক্তির দিন বাস্তবিকই এগিয়ে আস্‌ছে। কেন না জ্ঞান ছাড়া মুক্তি নেই। আর জ্ঞানের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে, গোঁড়ামী—কেন না গোঁড়ামির পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে বোকামি—তা সে গোঁড়ামি যে বিষয়েই হোক্ না কেন। "নারীর উক্তির" পিছনে ঠিক এমনি একটা মনের অনুভব আছে যে মন বিলিতি সভ্যতার দ্রব্যসম্ভারের তলেও চাপা পড়ে নি আবার স্বদেশী সভ্যতার উপবাস আনন্দেও ক্লিষ্ট হ'য়ে ওঠে নি।

"নারীর উক্তি"র আর একটা বিশেষ অভিনন্দনের কারণ এই যে এ "নারীর উক্তি" নারীরই উক্তি, উপরন্তু এর বেশীর ভাগ নারী বিষয়কও উক্তি বটে। দেশে যখন চারিদিক থেকে একটা কর্ম্ম-যোগের সাড়া পড়ে' গেছে তখন তা'তে গলা শোনা যাচ্ছে কেবল পুরুষের। কর্ম্মযোগের যখন সাড়া পড়্‌ল তখন চারিদিকে পরিবর্ত্তন হ'তে ত বাধ্য। সুতরাং আমরা বাংলার নারীসমাজকেও আর যেমনটী ছিল তেমনিটী রাখ্‌তে চাই নে। সুতরাং আমরা অর্থাৎ পুরুষরা আজ কেউ ঈজি-চেয়ারে লম্বা হ'য়ে প্রকাণ্ড একটা হাভানা চুরুট দাঁতে ধরে' আমাদের নারীসমাজকে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল হবার উপদেশ দিচ্ছি কিম্বা আর কেউ ফরাসে তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে প্রকাণ্ড একটা গুড়গুড়ির নল ঠোঁটে গুঁজে গান্ধারী হবার আদেশ কর্‌ছি। আমরা এই যে খোস্ মেজাজে বহাল তবিয়তে সোজা উপদেশ ও

লম্বা আদেশ চালাচ্ছি তা'তে যে নারী সমাজের উপরে ঐ উপদেশ ও আদেশ চালাচ্ছি সেই নারীসমাজ কি বলেন তা জান্‌বার জন্যে কৌতূহল, যার রক্তে কিছুমাত্র উষ্ণতা আছে, তারই হওয়া স্বাভাবিক। "নারীর উক্তিতে" বাংলা দেশের অন্ততঃ একটা শিক্ষিতা মহিলার মন আমাদের কাছে উন্মুক্ত হয়েছে। এবং এ এমন একটী শিক্ষিত মহিলা যার কাছে পাশ্চাত্যও অপরিচিত নয় আবার প্রাচ্যও অনাদৃত নয়। প্রত্যেকের মুক্তি যেমন তা'র আপনার সাধনার দ্বারাই হ'তে পারে অপরের বক্তৃতার দ্বারা নয়, তেম্‌নি নারী সমাজের উন্নতি হোক্ মুক্তি হোক্ তা তা'র আপনার সাধনাতেই হওয়া সম্ভব, কেবল মাত্র পুরুষ সমাজের বক্তৃতাতেই নয়। "কলের পুতুল হয় কি মানুষ তুল্লে উঁচু করে' ?" এ প্রশ্নের চিরকালের উত্তর একটা নিরেট "না।" সুতরাং পুরুষরা যে দেশ ব্যাপী গোলযোগ কর্‌ছেন তা'তে নারীকেও আজ গলা যোগ কর্‌তে হবে। আমাদের জাতীয় সমস্যা যেমন আমরাই ভাল বুঝ্‌তে পারি—আফগানিস্থানের আমীরও নয় বা লাসার লামাও নয়, তেম্‌নি নারীর যে সমস্যা তা নারীই ভাল বুঝ্‌তে পারেন পুরুষদের চাইতে। আজ দেশে নারী-সমস্যা পুরুষরা নারীকে বুঝাচ্ছেন কিন্তু তা'র চাইতে সহজ হবে যদি সেই নারী-সমস্যা নারীই পুরুষকে বুঝাতে পারেন। আসলে সমাজের সভ্য যখন পুরুষ ও নারী, তখন সমাজের সত্যও আছে পুরুষ ও নারী দু'জনের কাছেই ; সুতরাং সমাজের আসল মঙ্গলও গড়ে' উঠ্‌তে পারে পুরুষ ও নারীর দু'হাতে—পুরুষের এক হাতে বা নারীর এক হাতে নয়।

২

"নারীর উক্তিতে" লেখিকা প্রথমেই "বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা-বিচার" করেছেন। এই প্রবন্ধটার শেষ প্যারা পড়ে' আস্তিক ও নাস্তিকের গল্পটা মনে পড়ে। একবার এক নৌকোতে করে' এক আস্তিক ও এক নাস্তিক চলেছিলেন। পথে দু'জনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে মহাতর্ক। তিন ঘণ্টাব্যাপী তর্কে নাস্তিক প্রমাণ করে' দিলেন যে ঈশ্বর নেই। এমন সময় উঠ্‌ল মহা ঝড়। শোঁ শোঁ করে' বাতাস ছুট্‌ল। সেই বাতাসের নাড়া খেয়ে নদীর তরল বুকে, লক্ষ অজগর কিল কিল করে' জেগে উঠে রোষহুঙ্কারে তাদের লক্ষ ফণা আকাশে তুলে এদিক সেদিক করতে লাগ্‌ল। আর তারই মাথায় মাথায় নৌকোখানা আছাড় খেয়ে খেয়ে ফিরতে লাগ্‌ল। তখন কোথায় রইল নাস্তিক আস্তিক, কোথায় রইল তর্ক বিতর্ক! তখন যেমন আস্তিক তেম্‌নি নাস্তিক দুজনে মিলে ডাক্‌তে লাগলেন—হে ভগবান্, হে ভগবান্, হে ভগবান্! "বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা-বিচারের" শেষ প্যারাটা হচ্ছে এই, "পরিশেষে বক্তব্য এই যে একেলে পুরুষরা একেলে মেয়েদের যতই দোষ ধরুন, তাঁহাদের বর্ত্তমান সহধর্ম্মিণীর পরিবর্ত্তে যদি তাঁহাদের স্বর্গগতা ঠাকুর মা পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ান তাহা হইলে সত্যই কি তাঁহারা সন্তুষ্ট হন?" এ প্রশ্নের উত্তর আর ভেবে চিন্তে দিতে হয় না—আর সে উত্তরটা হচ্ছে একটা পরিষ্কার "না"। তবে কেউ প্রশ্ন তুল্‌তে পারেন—তবে যে অনেকে তর্ক তোলেন? তা'র উত্তর হচ্ছে সনাতন-ধর্ম্ম

রঙ্গার্থে। আমরা মনে আর মুখে যে এক নই সেটা ত আমাদের জীবনের সকল বিভাগেই জাজ্বল্যমান। এ বিষয়েও যে আমরা মনে আর মুখে এক নই সেটা শুধু এই প্রমাণ করে যে আর যাই হই না কেন আমরা inconsistent নই। আমাদের প্রধান দাবিই ত এই যে আমরা বদ্‌লিচি কিন্তু আমাদের ধারণা বদ্‌লায় নি। আমরা, "বদ্‌লাব না" "বদ্‌লাব না" বল্‌তে বল্‌তে বদলাচ্ছি। এই আমাদের ব্যবহারে ও কথায় এম্‌নি একটা ফাঁক জেগে উঠেছে যে ফাঁকটা কোন রকম সনাতন ধর্ম্ম দিয়েই আর বুজোন চলে না; আমাদের পরিবর্ত্তন হওয়াটা আমরা ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারি নে সেটা ত সৃষ্টিরই ধর্ম্ম—আবার আমরা সনাতন ধর্ম্মেরও মায়া ছাড়্‌তে পারি নে। ফলে আমরা টিকির উপরে হ্যাট্‌, ধুতির নীচে ফুলষ্টকিংএ বুট ইত্যাদি কিম্ভূতকিমাকার সব দৃশ্য গড়ে' তুলি যেটা অপরের কাছে নেহাৎ কমেডি আর নিজেদের কাছে বেজায় ট্রাজেডি হ'য়ে ওঠে।

৩

গ্রন্থকর্ত্রী 'বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষা-বিচার' প্রবন্ধটী গ্রন্থের গোড়ায় সজ্ঞানে দিয়েছেন না অজ্ঞানে দিয়েছেন তা আমরা জানি নে কিন্তু এটা জানি যে ঐ প্রবন্ধটী ঐ প্রথমে দেওয়া অতি যুক্তিযুক্ত হয়েছে। কেন না নারী সমাজের সম্বন্ধে যিনি যে কথাই বল্‌তে যান না কেন তাঁরই প্রথমে যে প্রশ্নটী উঠ্‌বে সেটা হচ্ছে, ঐ নারীর শিক্ষা সম্বন্ধীয়।

ঐ প্রশ্নটীর ঐ সমস্যাটীর সমাধান আমরা কেমন করে' করি তারই ওপরে নির্ভর করবে নারী সমাজের আর যা কিছু। সুতরাং এই প্রশ্নটীকে একটু খতিয়ে দেখলে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই—কেন না ঐ প্রশ্নটী হচ্ছে আসল।

নারীর শিক্ষার ব্যবস্থা—বেদ সম্বন্ধেই হোক আর বাইবেল সম্বন্ধেই হোক্—বড় বিশেষ তফাৎ নয়—আর সেটা যে ভয়ঙ্কর উদার তা বলা চলে না। কিন্তু এটা এখন বেদের আমলও নয় বাইবেলের আমলও নয় সুতরাং সেই ব্যবস্থাই আমরা চোখ বুঁজে মেনে নিতে পারি নে। বাইবেলের সময়টা কোন্ যুগ ছিল তা আমরা জানি নে কিন্তু এটা শুনতে পাই যে বেদের সময়টা ছিল সত্য যুগ। এবং শাস্ত্রে এ-কথাও আছে যে কলিযুগে সত্যযুগের সব ধর্ম্ম উল্টে যাবে। সুতরাং আজ আমরা স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে বেদের ব্যবস্থা না মেনে যে নতুন বিচার করছি তা'তে আমাদের শাস্ত্র বাক্যই পালন করা হচ্ছে। সুতরাং সনাতন পন্থীদের এতে করে' শাস্ত্র বাক্য অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাচ্ছে বলে' আনন্দ করা উচিত।

আসল কথাটা প্রথমেই স্পষ্ট করে' বলে' ফেলি—আমরা স্ত্রী-শিক্ষার ঘোরতর পক্ষে। এমন কি "বর্ত্তমান স্ত্রী-শিক্ষার"ও। "কেন না নাই মামার চাইতে কানা মামা ভাল"। কিন্তু ভুল করলেম। আমাদের দেশে নারীকে বর্ত্তমানে যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তা'র দোষ এ নয় যে সেটা কানা তা'র আসল আশঙ্কার কথা হচ্ছে যে তা অতিরিক্ত চক্ষুষ্মান। তা'তে করে' মেয়েদের এমনি তাড়াতাড়ি চোখ ফোটে আর মুখ ছোটে যে মন ফুটবার

আঁর অবসরই পায় না। ফলে মেয়েরা এক অশোভন অবস্থা থেকে আর এক অশোভন অবস্থা গায়ে জড়িয়ে নেয়। তবুও যে এই শিক্ষাকেও শ্রেয় মনে করি তা'র কারণ ওটা অনেক ভুল চুকের মধ্য দিয়ে এক-দিন-না-একদিন সত্যে গিয়ে দাঁড়াবেই ; কিন্তু শিক্ষা-হীনতার যে অবস্থা তা'র আর এদিক ওদিক হওয়ার উপায় নেই— সে একেবারে সনাতন।

একটা পরমাশ্চর্য্য বিষয় কিন্তু মনে না লেগে যায় না। সেটা হচ্ছে এই যে আমরা মেয়েদের শিক্ষা বন্ধ করবার জন্যে নানা সুরের নানা রকমের তর্ক তুলি ও প্রশ্ন করি কিন্তু ছেলেদের শিক্ষা বন্ধ করবার জন্যে আমাদের কোন তর্ক বা প্রশ্ন নেই। এর কারণ হয়ত এই যে আজও আমরা মেয়েদের দেখি বৈদিক চোখ দিয়ে আর বিচার করি বাইবেলি মন দিয়ে। কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে এটা বেদের আমলও চলছে না বা বাইবেলের আমলও চলছে না। সুতরাং সে-দেখার ও সে-বিচারের আজ মূল্য নেই। সে সমস্ত আজ অত্যন্তই অসাময়িক অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে anachronism. আসলে মানুষের—তা সে পুরুষই হোক্ বা স্ত্রীই হোক্—শিক্ষাটা যে অমঙ্গলের বস্তু তা আমরা কোনদিনই মানতে পারব না। পুরুষ স্ত্রীর যতই চোখ ফুটবে ততই যে তা'রা আপনার জন্যে ধ্বংসের পথই প্রস্তুত করে' চলবে এ-কথা বলাও যা, ভগবান মানুষকে চোখ দিয়ে বেজায় ভুল করেছেন এটা বলাও তাই।

৪

মানুষ প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ এবং স্বভাবতঃ ও সাধারণতঃ স্বার্থপর। সুতরাং স্ত্রী-শিক্ষায় আমাদের অর্থাৎ পুরুষদের যদি কেবল লোকসানই হয় তবে সেটা যে পুরুষদের পক্ষে সমর্থন করা কতদূর অস্বাভাবিক সুতরাং অসহজ তা সহজেই অনুমেয়। বিশেষতঃ কোন কিছু চিরকাল প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে থাকতে পারে না যদি সেটা কোন দিককার লোকসানের উপরে চলতে থাকে। একটা মন যেখানে আর একটা মনকে আঘাত করে' চলেছে সেখানে যে-মন আঘাত পাচ্ছে সে-মন সে-আঘাতকে সহজে বরণ করে' নিতে পারে না—সেটা সৃষ্টিরই নিয়ম নয়। সুতরাং মেয়েদের শিক্ষায় আমাদের অর্থাৎ পুরুষদের কি লাভ সেইটের হিসেব নেওয়ার কথা প্রথমেই মনে জাগে।

আমরা যে বহুং বদলিচি অর্থাং আমরা যে ঠিক আমাদের পিতামহদের মতো হুবহু নই সেটা নিতান্ত চোখ কান শক্ত করে' বুজে না থাকলে আর অস্বীকার করা চলে না। সুতরাং আমাদের পিতামহরা আমাদের পিতামহীদের কাছ থেকে যা চাইতেন আমরা আমাদের সহধর্ম্মিণীদের কাছ থেকে আজ আর ঠিক তা চাচ্ছি নে। আমাদের তিন পুরুষে পুরুষের দাবীর পরিবর্ত্তন হয়েছে। এই দাবীর নিশানা সংক্ষেপে দেওয়া যেতে পারে। আমাদের পিতামহরা আমাদের পিতামহীদের কাছ থেকে চাইতেন খুব চমৎকার কুমড়োর সুক্তো আর সজনে খাড়ার ডালনা কিন্তু আজ আমরা আমাদের

বিবাহিতা স্ত্রীর কাছ থেকে চাচ্ছি তাঁদের মন অর্থাৎ পিতামহেরা চাইতেন রসনার সম্ভোগ, আমরা চাচ্ছি মনের সন্তোষ। এই যে পরিবর্ত্তন, এই যে আজ আমরা মনের সন্তোষ খুঁজ্‌ছি, আমাদের মন দিয়ে অপরের মন পেতে চাচ্ছি এটাকে যাঁরা আমাদের অধোগতির চিহ্ন বলে' বিবেচনা করেন তাঁদের আর যাই হোক্ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দীপটা যে খুব উজ্জ্বল নয় তা শাস্ত্রের সাহায্যেই প্রমাণ করা যেতে পারে।

আমাদের পিতামহদের আমলে আট নয় দশ বা এগার বছরে মেয়েরা শ্বশুর বাড়ীতে এসে শ্বাশুড়ীর হয় অদৃষ্টের দোষে লাঞ্ছনা গঞ্জনা খেয়ে নয় কপাল গুণে প্রশংসা সুখ্যাতি শুনে নিশাযোগে যেতেন স্বামীর পদসেবার জন্যে। সে যুগে যুবক ও তা'র বালিকা বধূর মধ্যেকার দেহের সম্বন্ধটাকে এমন বিশ্রী রকম সুস্পষ্ট ও প্রধান করে' তোলা হয়েছিল যে মানুষের আদিম সমাজের পুরুষ নারীর সম্বন্ধের সঙ্গে তা'র প্রভেদ প্রায় নেই বল্লেই চলে। কিন্তু আজ আমরা সবার প্রথমে যা চাই সেটা হচ্ছে মন দিতে ও মন নিতে। সুতরাং আজ আমরা চাচ্ছি মেয়েদের এমন একটা বয়েস যখন তাদের মন সজাগ হবে ও তাদের এমন একটি শিক্ষা যাতে তাদের মন সজীব হবে। কেননা মন থাক্‌লেই সে মন দেওয়া নেওয়া চল্‌তে পারে। এই যে আমাদের মনের দিক থেকে পরিবর্ত্তন এই পরিবর্ত্তন অনুসারে বন্দোবস্ত করতে হ'লে চাই মেয়েদের মন গঠন অর্থাৎ চাই তাদের শিক্ষা। এই দিক থেকে মেয়েদের প্রথম লাভ হবে। কেননা এতে করে' আমাদের নতুন যে দাবী তা পূরণ হবার

সম্ভাবনা। তবে প্রবীণ ঔদরিক যাঁদের রসনায় সুক্তো ও ডাল্‌নার আস্বাদ সবার চাইতে বড় সত্য হ'য়ে রয়েছে তাঁরা নাকের ডগা আকাশে তুলে বল্‌তে পারেন যে আমাদের এ-সব হচ্ছে নভেলিয়ানা; তখন আমাদের চোখের তারা মাটীতে নামিয়ে বল্‌তেই হবে যে তাঁরা মানুষের অন্তরের উচ্চতর রহস্যের কোনই সন্ধান পান নি —তা তা'তে তাঁরা শাস্ত্রের বচনই আওড়ান বা সনাতন ধর্ম্মেরই দোহাই দেন।

একথাটা আমরা বার বার করে' বলব যে শাস্ত্রে লেখা নিঃশেষে শেষ হ'য়ে গেছে সে শাস্ত্রের চাইতে মানুষের মন বড়। কেন না সে শাস্ত্রের শেষ পৃষ্ঠা লেখা হ'য়ে গেছে কিন্তু মানুষের মনের শেষ কথাটি আজও বলা হয় নি—কোন দিন হবে কি না সেটাও সন্দেহ। সুতরাং শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে মানুষের মন ঠেকিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা করাও যে কথা, ডুটো কুল বেলের পাত ফেলে মন্ত্র পড়ে' গঙ্গোত্রীতে গঙ্গা প্রবাহকেও ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টাও সে কথা।

সে যা হোক্ আসল কথা হচ্ছে এই যে আজ তরুণরা তরুণীদের কাছ থেকে চাচ্ছে সবার আগে তাদের মন—একটা সহজ ও সজীব মন—একটা negative কিছু নয় একটা positive কিছু। এবং এই মন তা'রা চায় সমৃদ্ধিশালী করে'—যে মনে এমন ভাব এমন চিন্তা সব থাক্‌বে যে-ভাব যে চিন্তা তাদের নিজেদের প্রাণে খেল্‌ছে, নিজেদের মনে উঠ্‌ছে। এক দিককার শিক্ষার গুণে ও আর এক দিককার শিক্ষাহীনতার দোষে আজ দেশে এমনি অবস্থা দাঁড়িয়ে গেছে যে পুরুষের অধিকাংশ কথাই নারীর অধিকাংশেই বুঝ্‌তে

পারেন না। শিক্ষার ও শিক্ষাহীনতার ঐ ব্যবস্থাই যদি চলে তবে এমন দিন আস্‌তে বাধ্য যখন এই বাঙালীর সমাজে কোন পুরুষের কোন কথাই কোন নারী বুঝ্‌তে পার্‌বেন না। সে অবস্থায় দাম্পত্য জীবনটা যে খুব সুখের হবে তা কেবল তাঁরাই বল্‌তে পারেন যাঁদের জীবনে দেহটাই হচ্ছে সবার চাইতে বড়।

এই হচ্ছে আমাদের স্ত্রী-শিক্ষার লাভের হিসেব। লাভ, কেননা মেয়েদের শিক্ষায় আমাদের নূতন দাবীর পূরণ হবে। ঐ নূতন দাবী আজ আমাদের এম্‌নি বড় সত্য হ'য়ে উঠেছে যে তা'র কাছে আমরা সুক্তো ও ডাল্‌নার লোভকে বলি দিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত নই। সুক্তো ও ডাল্‌নার চাইতে একটা বড় আনন্দের সন্ধান আমরা পেয়েছি। এই বড় আনন্দের সন্ধানকে নাকচ করে' দেবার ক্ষমতা কোন শাস্ত্রীয় শ্লোকেরও নেই বা কোন অশাস্ত্রীয় সামাজিক আচারেরও নেই।

৫

আর একটা মস্ত লাভের কথা ভয়ে ভয়ে বলি। মেয়েরা শিক্ষিত হ'লে বাধ্য হ'য়ে পুরুষদের "পতি দেবতার" আসন ত্যাগ করতে হবে। পুরুষদের পক্ষে এটা একটা মস্ত লাভের কথা। কথাটা একটু বিশদ করে' বল্‌ছি।

পড়ে-পাওয়া টাকাটা চোদ্দ আনাতেই ছাড়ি। যে-জিনিসটা মানুষ কোন রকম চেষ্টা বা উদ্যম না করে' পেয়েছে, কোন রকমের

মূল্য না দিয়েই আয়ত্ত করে' বসেছে, সে-জিনিসের প্রতি মানুষের সাধারণতঃ বড় বিশেষ দরদ জন্মে না। "পতি-দেবতা"র আসনটা মনের প্রাণের হৃদয়ের কোন রকম মূল্য না দিয়ে আমাদের এমনি সহজে দখলে আসে যে ওর দেবত্বটার চর্চ্চা করবার কোন কথাই আর আমাদের মনে ওঠে না। ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের দেবত্ব থাক্ বা না থাক্ সমাজের directoryতে পতিরা দেবতা নামেই লিষ্টভুক্ত। এমন কি যে-মানুষটা সমাজের সবার কাছেই অতি সাধারণ হ'য়ে ষাট্ বছর কাটিয়ে গেলেন তিনি অনুগ্রহ করে' একটা বিয়ে করলেই অমনি একটা অসহায় ওমুক প্রাণীর কাছে একেবারে দেবতা হ'য়ে ওঠেন। ষাট্‌·বছর পরে হঠাৎ একদিন যে তা'র দেবত্বটা কোথা থেকে আসে তা বলা মুস্কিল। কিন্তু সমাজ সনাতন সনন্দ দিয়ে রেখেছে। I. C. S মেম্বরদের একটা পরীক্ষা দিতে হয়। কিন্তু আমাদের "পতি-দেবতা"দের কোন পরীক্ষাই নেই—না সমাজের কাছে—না যার কাছে দেবতা হবেন তা'র কাছে। পরানুগ্রহে প্রতিপালিত হ'তে হ'তে যেমন মানুষের মনুষ্যত্ব পুরুষত্ব লয় পেয়ে যায়, অপর পক্ষে নিজের পরিশ্রমে চেষ্টায় অর্জ্জনে মনুষ্যত্ব পুরুষত্বের স্ফুরণ হয়, তেমনি এমনি বিনা আয়াসে 'পতি-দেবতা'র আসন ভোগ করে' করে' আমরা দেবতা ত হইইনি বরং সে আসন ব্যক্তিগত কষ্ট ও শ্রম করে' যদি আমরা রচনা করতে পারতেম তবে দেবতা না হই অন্ততঃ আমাদের মনুষ্যত্বের যে স্ফুরণ হ'তে পারত তা পর্য্যন্ত হয় নি। এতে করে' আমরা পুরুষরা একটা মস্ত সুযোগ হারিয়েছি। মনুষ্যত্ব দেখাবার ক্ষেত্র ত আমাদের এমনিই কম। আমাদের

প্রত্যেকেরই যদি আমাদের জীবনের বসন্তাগমে অন্ততঃ একটী তরুণীর কাছে আমাদের মনুষ্যত্ব প্রমাণ কর্‌বার বন্দোবস্ত থাক্‌ত তাহ'লে তা'তে করে' আমাদের মস্ত লাভ হ'ত। কিন্তু সমাজের সনন্দ সে-পথ বন্ধ করে' রেখেছে।

কিন্তু মেয়েরা শিক্ষিতা হ'লে এই আরামের ব্যবস্থা শিথিল হ'য়ে হ'য়ে অবশেষে উল্টে যেতে বাধ্য। কেননা মেয়েরা শিক্ষিতা হ'লে তাদের মনের গায়ে আকাশের আলোক ও বাতাসের পুলক লাগ্‌তে বাধ্য। সে-অবস্থায় তাদের মন প্রাণ প্রাচীন ও প্রবীণ সব সংস্কার থেকে মুক্ত হবে। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাদের একটা স্বাধীন সত্তা, একটা ব্যক্তিত্ব ফুট্‌বেই। সে-অবস্থায় তাদের মনে এই সৃষ্টির যাবতীয় বস্তু ও বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বামী ও সমাজ সম্বন্ধেও নানা প্রশ্ন উঠ্‌বে। তখন "পতি-দেবতাদের" সমাজের দেওয়া সনন্দ খেলো হ'য়ে পড়্‌তে বাধ্য। অবশ্য অনেকের সূক্ষ্ম বুদ্ধি এই বন্দোবস্ত কর্‌তে চান যে আমরা আমাদের মেয়েদের শিক্ষিতও কর্‌ব আবার ক'নে বউও করে' রাখব, যেমন কোন কোন ইংরেজ রাজপুরুষ হয়ত ভেবেছিলেন যে তাঁরা ভারতবাসীকে Mill, Byron, Shelley ও পড়াবেন আবার Hewers of wood ও Drawers of water করে'ও রাখ্‌বেন। কিন্তু সৃষ্টির নিয়মটা এমনি অসুবিধাজনক যে তা হয় না। মন যেখানে মুক্ত ও উদার হয়েছে জীবনকে সেখানে সুপ্ত ও সংকীর্ণ করে' রাখা যায় না। ঘোড়াটার পিঠে ছুট্‌বার জন্যে সপাসপ্ চাবুক লাগাচ্ছি আবার প্রাণপণে রাস টেনে রাখ্‌ছি তা'তে ঘোড়াটাও ক্ষেপে ওঠে—মানুষ ত মানুষ। সে

যা হোক মেয়েদের স্বাধীন ভাবে বুঝ্‌বার চিন্তা কর্‌বার ক্ষমতা হ'লে প্রশ্ন কর্‌বার সাহস জন্মালে আমাদের "পতি দেবতাদের" মধ্যেকার প্রমাণিত দেবতাটীকে লজ্জায় লুকিয়ে পড়্‌তেই হবে। কেন না ফাঁকি জিনিসটা প্রশ্নের সাম্‌নে মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারে না। এতে করে' পুরুষরা ত একটা মস্ত অপরাধের দায় থেকে অব্যাহতি পাবে। এবং তাদের আত্মার মঙ্গল হবে। কেন না তা'তে তা'রা সমাজের দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া একটা মস্ত মিথ্যা থেকে মুক্ত হবে। আর মিথ্যাই হচ্ছে অমঙ্গল। মেয়েরা শিক্ষিত হ'লে আমাদের অর্থাৎ পুরুষদের এই একটা মস্ত লাভ।

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে পুরুষদের মঙ্গল হোক্ কিন্তু মেয়েদের কি? তাদের এমন একটা ভক্তি-চর্চ্চার সুযোগ হারিয়ে যাবে—এমন একটা ভক্তির উপলক্ষ্য চলে' যাবে। কিন্তু ভয় নেই, ভক্তির সুযোগ যাবে কিন্তু হৃদয় শূন্য থাক্‌বে না, সেখানে প্রেমের অবদান আস্‌বে। এবং এই প্রেমের সম্বন্ধই তরুণ তরুণীর মধ্যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সত্য ও সহজ সম্বন্ধ। এবং ভক্তির চাইতে যে প্রেম বড়—মধুর প্রেম বড়, তা বৈষ্ণব শাস্ত্রেই আছে।

৬

আমাদের স্ত্রী হচ্ছে স্বামীর সহধর্ম্মিণী। আসলে সকল স্বামীর স্ত্রীই তা'র সহধর্ম্মিণী—তা সে সূত্র বেঁধেই বলা হোক্ বা উহ্যই থাকুক। কেননা স্বামী স্ত্রীর মনের মিল্ না থাক্‌লে সংসারটা

ঝক্‌মারি হ'য়ে উঠ্‌বে। কিন্তু স্ত্রী সহধর্ম্মিণী হ'তে পারে না যদি না সে হয় সহমর্ম্মিণী। আমাদের পুরুষ-সমাজের ও নারী-সমাজের মর্ম্মের মিল নেই কেননা তাদের মনের চেহারা এক নয়। ও-দুয়ের মাঝে শিক্ষার বৈষম্যে আজ পুরুষের মনের গায়ে বাতাস লেগেছে সাত সমুদ্রের না হলেও অন্ততঃ তের নদীর, কিন্তু নারী-সমাজের মনের গায়ে যা লাগ্‌ছে সেটা হচ্ছে চুলোর আঁচ। ফলে আজ পুরুষ-সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষার নারী-সমাজের কাছে কোন মূল্য নেই। এমন অবস্থায় স্ত্রী স্বামীর সহধর্ম্মিণী হ'তে পারে না।

তাই আজ বাঙালীর সংসারে ঘরে ঘরে বাধা। পুরুষ সমাজের বৃহৎ আকাঙ্ক্ষার সম্মুখে নারীসমাজ তা'র দুর্জ্জয় অজ্ঞানতা ও সংকীর্ণতা নিয়ে বসে'। এমনি ত বাইরের বাধাই দুস্তর। তারপর ঘরে ঘরে এই যে বাধা—যে বাধার জোর কেবল দুর্ব্বলতার জোর—এই বাধা যে পুরুষের পা'কে পিছনে ঠেলে রাখ্‌তে পারে তা দেখ্‌বার জন্যে খুব দিব্যদৃষ্টির দরকার করে না। এই বাধাকে পুরুষদের প্রতিপদে জয় করে' অতিক্রম করে' চল্‌তে হচ্ছে। তা'তে কত যে শক্তির অপব্যয় হ'চ্ছে তা'র ইয়ত্তা নেই। এই অপব্যয় কত আপশোষের। কেন না যেখান থেকে পুরুষ-সমাজ শক্তি পেতে পারত সেখান থেকে তা'রা শক্তি কেবলই যে পাচ্ছে না তাই নয়, উল্টে আরও সেখান থেকে তাদের শক্তির অপহরণ চল্‌ছে। আজ যদি পুরুষ-সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষার পিছনে, তাদের স্বপ্নের পিছনে, নারী-সমাজের উৎসাহবাণী থাক্‌ত, তাদের প্রাণের জ্বলন্ত অনুমতি থাক্‌ত আজ যদি বাঙালী-সমাজে পুরুষের কর্ম্মের পিছনে নারীরও

মর্ম্মের রঙিন্ স্বপ্নের অবলেপ থাক্‌ত তবে আজ পুরুষ চতুর্গুণ শক্তিশালী হ'য়ে উঠ্‌ত। কিন্তু আজ বাঙালী পুরুষের বৃহৎ কর্ম্মানুষ্ঠানে বাঙালী-নারীর শক্তি ঢাল্‌বার সামর্থ্য নেই। কেননা আজ বাঙালী পুরুষ যে-শিক্ষায় যে-সাধনা আপনার করে' নিয়েছে বাঙালী নারী সে-শিক্ষা পায় নি।—এই যে বৈষম্য এই বৈষম্য অনন্তকালেও কোন সমাজের পক্ষে মঙ্গলময় হ'তে পারে না। এখন পুরুষের সঙ্গে নারীর শক্তির সংযোগ ঘটাতে হ'লে পুরুষ নারীর মন ও মর্ম্ম এক করতে হবে। আর তা করতে হলে পুরুষ যে শিক্ষা পাবে নারীকেও সেই শিক্ষাই দিতে হবে। পুরুষ পড়্‌বে বাইবেল আর নারী পড়্‌বে বেদ, তা'তে পুরুষ নারীর মধ্যেকার বৈষম্য ত ঘুচ্‌বেই না বরং সে বৈষম্য আরও উৎকট ও সাংঘাতিক হবে। সুতরাং বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষাকে নাকচ করতে হ'লে আগে বর্ত্তমান পুরুষের শিক্ষাকে নাকচ করতে হবে। অবশ্য যদি পুরুষ নারীর মধ্যেকার বিষম বৈষম্য ঘুচোবার মতলব থাকে। এবং আমি আগেই বলেছি যে এই বৈষম্য না ঘুচ্‌লে পুরুষসমাজ নারীসমাজের কাছ থেকে শক্তি সংগ্রহ করতে কোন দিনই পার্‌বে না।

আমাদের অত্যধিক আধ্যাত্মিকতা চর্চ্চার ফলেই হোক্ বা আর যে কোন কারণেই হোক্ পুরুষরা যে বাইরের কর্ম্মানুষ্ঠানে নারীর কাছ থেকে শক্তি সংগ্রহ করতে পারে সে জ্ঞান আমরা হারিয়েছি। তাই নারী-আত্মার প্রকাশের জন্য আমরা সুবৃহৎ রন্ধনশালাটা নির্দ্দিষ্ট করে' দিয়েছি। আমাদের ধারণা নারী অবলা। কিন্তু একথা আমরা ভুলে গিয়েছি আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষেরা শক্তির রূপ

গড়ে' ছিলেন দেবী মূর্ত্তিতে। নারী অবলা সে কার কাছে? অনাত্মীয়ের কাছে। কিন্তু নারী-আত্মার যে একটা তীব্র একনিষ্ঠতা আছে তা পুরুষের আত্মায় নেই, নারীর প্রাণে যে একটা জ্বলন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা অনুভব কর্‌বার ক্ষমতা আছে তা পুরুষের প্রাণে নেই। এই একনিষ্ঠতা এই উৎসাহ উদ্দীপনা নারী আপনার জনের মধ্যে সংক্রামিত করে' দিতে পারেন। নারী এইখানে অবলা নয়। নারীর বল সে বাহুবল নয় সেটা তা'র আত্মার বল। নারীর এই শক্তি আজ বৃহৎ সমাজের বৃহৎ কর্ম্মানুষ্ঠানে নির্জ্জীব। কারণ তাদের অজ্ঞতা, কারণ তাদের শিক্ষার অভাব।

এখন একটা প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে যে এই যে বর্ত্তমান শিক্ষা—যাকে ইংরেজি শিক্ষাই বল বা বিলিতি শিক্ষাই বল এর পরিণাম ফল শুভ না অশুভ? এর পরিণামে সমাজ ও জাতির পক্ষে এমন একটা দুর্ঘটনা আছে কি না যার ক্ষতি পূরণ আর কোন দিনই কিছু দিয়েই হ'তে পারে না?

এ প্রশ্নের উপরে কোন তর্ক চল্‌তে পারে না। কেন না আমাদের কারোই ভবিষ্যৎ দেখ্‌বার ক্ষমতা নেই। কাজেই ভবিষ্যতে কি হবে তা নিশ্চয় করে' কেউ বল্‌তে পারেন না। তবে জগতে দু'রকমের লোক আছেন—এক রকম হচ্ছে ইংরেজিতে যাঁদের বলা হয় pessimist, অর্থাৎ সর্ব্ব বিষয়ে যাঁরা খারাপটাই আগে ভেবে বসে' থাকেন। আর অন্য প্রকার হচ্ছে optimist,—যাঁদের চিরকাল বিশ্বাস যে মঙ্গলকে পাওয়া যাবেই যাবে। ইংরেজি শিক্ষা সম্বন্ধে ঐ যে প্রশ্ন, এর পরিণাম ফল শুভ না অশুভ হবে—এর

উত্তর ঐ দু'দলের লোক তাঁদের প্রকৃতি অনুসারে দু'রকমে দেবেন। এইখানে স্বীকার করি যে আমরা ঐ দ্বিতীয় দলের লোক—অর্থাৎ optimist. ঐ শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের কোন শঙ্কাও নেই সন্দেহও নেই।

কিন্তু কেউ যেন ভুল না করেন। আমার এ কথা বলা উদ্দেশ্য মোটেই নয় যে বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীটাই সেরা—শিক্ষা দেবার ওর চাইতে উৎকৃষ্টতর আর কোন প্রণালী আমাদের জন্যে হ'তে পারে না। তবে রামের চাইতে শ্যামের কাছ থেকে বেশী ও বড় উপকার পেতে পার্‌তেম বলে' রামের কাছ থেকে যে উপকারটুকু পেয়েছি তা যে অস্বীকার কর্‌ব এমন মন কারোই থাকা উচিত নয়। ইংরেজি শিক্ষার দোষ গুণ আর যাই থাক্ না কেন এর ফলে যে একটা মহৎ জিনিস আমরা লাভ করেছি সেটা এম্‌নি পরিষ্কার যে তা আর কারো ভুল কর্‌বারই সম্ভাবনা নেই। এই মহৎ জিনিসটী হচ্ছে মনের মুক্তি ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। কেউ জিজ্ঞেস্ কর্‌তে পারেন যে এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যে ইংরেজি শিক্ষার ফলে তা'র প্রমাণ কি? তা'র প্রমাণ হচ্ছে এই যে কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কি সাহিত্যের বাগানে কি সামাজিক বৈঠকে যেথানেই স্বাধীনতার বাণী উচ্চারিত হচ্ছে বা তা'র জন্যে সাধনা আরব্ধ হয়েছে সেখানেই দেখ্‌ছি তা'র পিছনে রয়েছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া মানুষ, নবদ্বীপের চতুষ্পাঠী পড়া পণ্ডিত নয়। তবে মনের এই মুক্তি এই স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে যদি কেউ আমাদের জাতীয় জীবনে একটা প্রচণ্ড দুর্ঘটনা বলে' মনে করেন তবে আমরা নাচার,—তবে আমরা

মাথা নুইয়ে স্বীকার করব যে তাঁর সঙ্গে কথা বল্‌বার ক্ষমতা আমাদের নেই।

অনেকের আশঙ্কা যে ইংরেজী শিক্ষার ফলে আমাদের নারী-সমাজ কাপড়ের বদলে গাউন পর্‌বে, সিঁদুরের বদলে বনেট্ ধর্‌বে অর্থাৎ আমাদের মেয়েরা একদম মেম বনে যাবে। অবশ্য কোথাও কেউ মেম বনেছেন কি না তা আমার জানা নেই। তবে শিক্ষার ফলে মেয়েদের মন যে একটু বিভিন্ন রকমের হবে সেটা ত ধরা কথা। এবং সেই জন্যই ত শিক্ষা দেওয়া। নথ-নাকে রাঙাদিদির মনের সঙ্গে বি-এ পাশ মুক্তিদেবীর মনের যদি কোনই পার্থক্য না থাকে তবে এত কষ্ট করে' মুক্তি দেবীর বি-এ পাশ কর্‌বার দরকারই বা কি? এই মনের পার্থক্যের জন্য তাদের চাল চলনেও যে কতকটা পার্থক্য দাঁড়াবে সেও ত জানা কথা। তবে চাল চলনের ঐ পার্থক্যটাকেই যারা মেমত্ব বলে' মনে করেন আসলে তা'রা মেম বলে কোন বস্তু বা ব্যক্তি দেখেন নি, দেখ্‌লেও বোঝেন নি! জাতীয় বৈশিষ্ট্য যদি কিছু থাকে—তবে তা এত সহজে নষ্ট হয় না এবং পরের জাতীয়ত্বও অত সহজে আয়ত্ত করা যায় না। কিন্তু সে যা হোক্ আমাদের মেয়েরা যে মেম বনে যাবে না তা'র প্রমাণ আমাদের চোখের ওপরেই রয়েছে। সে প্রমাণটা হচ্ছে এই যে দেখ্‌তে পাচ্ছি এত কাল ইংরেজি শিক্ষার পর আমাদের পুরুষ সমাজ পাজামাও পরে নি আর হ্যাটও ধরে নি। বরং এখন বিলেত থেকে ফিরে এসেও অধিকাংশেই ধুতি চাদর পর্‌ছেন। অথচ তাঁরা দেশে এসে কিছুদিন নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করেন বলে'

অন্ততঃ আমার ত জানা নেই। সুতরাং একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে পুরুষরা যখন সাহেব বনে নি মেয়েরাও তখন মেম বন্‌বে না। কারণ এ কথা সবাই জানেন যে পুরুষদের চাইতে মেয়েরা বেশী রক্ষণশীল। তবে আমাদের মেয়েরা ঠিক গান্ধারী যে হ'য়ে উঠ্‌বে এমন কোন গ্যারান্টিও নেই। তবে সেটাকে আমরা দুর্ঘটনা বলে' মনে করি না।

আবার অনেকের ধারণা আছে যে মেয়েরা শিক্ষিতা হ'লে স্বাধীন-মনা হ'লে পুরুষ স্ত্রীর সম্বন্ধ, পরিবারের বনিয়াদ সব একেবারে ভেঙে চুরমার হ'য়ে যাবে। অর্থাৎ এদের ধারণা সমাজ সংসার ইত্যাদির পেছনে কোন সত্য নেই, সে সব কোন রকমে ঠেকা ঠুকো দিয়ে রাখা হয়েছে; পারিবারিক জীবনের মূলে কোন সহজ প্রেরণা নেই, মেয়েদের দেহ মন প্রাণ বুদ্ধিকে পঙ্গু করে' কোন রকমে সেটাকে খাড়া করে' রাখা হয়েছে। মেয়েরা যেই একবার শিক্ষিত ও স্বাধীন হবে ওমনি তা'রা উধাও হ'য়ে ছুটে যাবে। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই? আমাদের বিশ্বাস কিন্তু উল্টো। পুরুষ স্ত্রীর সম্বন্ধের পিছনে, সংসার সমাজ পরিবার এ সবের পিছনে এমন একটা সহজ সত্য নিত্য হ'য়ে আছে যা পৃথিবীর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিই ভেঙ্গে দিতে পারে না। সুতরাং মেয়েরা শিক্ষিতা হলেই যে পরিবারের বনিয়াদ ধসে যাবে তা নয়। প্রকৃতপক্ষে আমরা চোখের সাম্‌নেই ত দেখ্‌ছি যে যে-সব দেশে মেয়েরা শিক্ষা পাচ্ছে সে-সব দেশে পরিবার নামক পদার্থটী একেবারে ভেসে যায় নি। তবে মেয়েরা শিক্ষিতা ও স্বাধীনা হ'লে আমাদের সমাজের বা

পরিবারের চেহারা বদলে যাবে নিশ্চয়। তবে সমাজের যে চেহারা চলে' আসছে সেই চেহারাই যে প্রাণপণে রক্ষা করতে হবে এমন মতলব আমাদের নয়। আমাদের ঝোঁক ত'ার ওপরে নয় আমাদের সমস্ত ঝোঁক মানুষের শিক্ষার ওপরে, মুক্তির ওপরে। পুরুষ নারী শিক্ষিত হোক্ মুক্ত হোক্। শিক্ষিত পুরুষ নারী যে সমাজ যে পরিবার গড়ে' তুল্‌বে সেই সমাজকে সেই পরিবারকে শিরোধার্য্য করে' নেবার মতো সাহস ও ক্ষমতা আমাদের আছে ও ভবিষ্যৎ বংশীয়দের হবে।

অবরোধের কথা

চোখে-দেখা যে খুন সে-খুনের আসামীরও নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্ত কিছু-না-কিছু বল্‌বার থাকে—সুতরাং অবরোধ প্রথার স্বপক্ষেও যে কিছু বল্‌বার আছে, তা আইন আদালত সম্বন্ধে যাঁদের কিছুমাত্র জ্ঞান আছে তাঁরাই স্বীকার কর্‌বেন। অবরোধটাকে খুনী আসামী বলে' মান্‌লেও, অবশ্য চোখে দেখা খুন নয়। এ-খুন হচ্ছে আধ্যাত্মিক মেথডে। অবগুণ্ঠনের অন্তরালে আধ্যাত্মিক মেথডে যে হত্যা তা চোখে দেখা যায় না। এমন কি হাজার করা ন'শ নিরনব্বই "কেসে" যে মরে, সে নিজেই বুঝে উঠ্‌তে পারে না যে, সে মর্‌ছে। সুতরাং পর্দা বিরোধী যাঁরা তাঁরা অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ আনেন, সে-সব অভিযোগের বিরুদ্ধে আমি ওকালতি কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ব।

২

অবরোধ প্রথার বিপক্ষ দল অবরোধের বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ আনেন, সে-সব অভিযোগ থেকে সকল প্রকারের অলঙ্কার, কবিত্ব,

যুক্তিতর্ক, মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি সকল রকমের বাহুল্য বর্জ্জন করে' তা'র একটা চুম্বক কর্‌লে যা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে এই, প্রথমত—এই অবরোধ প্রথার মধ্যে বঙ্গীয় মহিলারা অত্যন্ত কষ্টে কাল যাপন করেন দ্বিতীয়ত—সমাজে স্ত্রী-জাতির অবরোধ সমগ্র সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর। এই দু'টি সিদ্ধান্ত কতদূর ঠিক তা আমাদের দেখ্‌তে হবে।

আমরা আজ সবাই দেশচর্য্যায় ব্রতী সুতরাং সমাজের দিক থেকেই জিনিসটাকে আগে দেখ্‌ব—কেননা ব্যক্তির চাইতে সমাজই হচ্ছে সকলের মতে দেশের বৃহত্তর রূপ। সিদ্ধান্তটা হচ্ছে যে, অবরোধ প্রথাটা সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর। কিন্তু আমাদের জাতীয় ও সামাজিক দুর্গতির জন্য অবরোধ প্রথা যে কতদূর দায়ী, সে-বিষয়ে কারও কোনও স্পষ্ট ধারণা আছে বলে ত আমার মনে হয় না।

সুতরাং আমরা দ্বিতীয় প্রস্তাবটির প্রতি নজর দেব। সেটা হচ্ছে এই যে, অন্তঃপুরবাসিনী বঙ্গমহিলারা অত্যন্ত কষ্টে কাল যাপন করে' থাকেন। দেখ্‌তে হবে কথাটা কতদূর সত্যি।

ইতর প্রাণী ও মানুষের মধ্যে মস্ত একটা প্রভেদ দাঁড়িয়েছে। ইতর প্রাণীর মধ্যে instinct প্রবল; মানুষ—কি পুরুষ কি স্ত্রী—instinctকে ছাড়িয়ে উঠেছে। কথাটা বাঙলা করে' বল্‌লে এই দাঁড়ায় যে, ইতর প্রাণীর মধ্যে প্রকৃতি একাধিপত্য কর্‌ছে; কিন্তু মানুষের মধ্যে পুরুষ আপনার সন্ধান পেয়েছে—এবং সে প্রকৃতির উপরে আপনার আধিপত্য স্থাপন কর্‌বার জন্যে প্রকৃতির সঙ্গে

সংগ্রাম করছে। সে যে প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বশীভূত করতে পেরেছে তা নয়, তবে মানুষ আর পশু নেই। মানবের মধ্যে পুরুষ আপনার সন্ধান পেয়েছে বলে', আপনার অধিকার, আপনার রহস্য জেনেছে বলে' মানবের স্বাধীনতাও বেড়েছে, তা'র সুখ দুঃখের ফরমূলা বদলেছে, তা'র আশা আকাঙ্ক্ষার চেহারার পরিবর্ত্তন হয়েছে, তা'র সমস্ত জীবনের ভঙ্গিমাটাই একটা নূতন ছাঁচে গড়ে' উঠ্ছে।

মানবের মধ্যে পুরুষ জাগ্রত হয়েছে বলে' পুরুষ নারীর মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘট্ছে—সেই পুরুষের ইচ্ছা শক্তির জোরে। প্রকৃতি হচ্ছে জ্ঞানহীনা। সে পুনরুক্তি ছাড়া, একই জিনিসকে, একই বিষয়কে বার বার একই ভাবে সৃষ্টি করা ছাড়া, আর কিছু পারে না। সেই জন্য দেখি যেখানে পুরুষের আবির্ভাব হয় নি সেখানে প্রকৃতির একই রূপ। বৈদিক যুগের গরুটা থেকে আজকার গরুটার কিছুই প্রভেদ নেই। শিশু যিশুকে পিঠে করে' যে গাধাটা ঈজিপ্টে পৌঁছিয়েছিল, সেটার সঙ্গে আমাদের অতি সাধারণ ধোপার গাধাটার কোনই অমিল নেই। তেমনি সকল প্রকার ইতর প্রাণী উদ্ভিদ ইত্যাদির কোনই পরিবর্ত্তন নেই। পাঁচ হাজার বছর আগে শাল্মলী তরুটা ঠিক যে ভাবে যে অবস্থার ভিতর দিয়ে যে নিয়মে গড়ে' উঠেছে—আজকার শাল্মলী তরুটাও তাই। যে বট গাছটার তলায় শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হলেন সেটাও যা—আর আজকার যে বট গাছটার তলায় পানওয়ালী পানের খিলি বেচ্ছে, ফৌজদারী মোকদ্দমার সাক্ষীরা তামাক খাচ্ছে—সেটাও তাই। কিন্তু এক মানুষের সম্বন্ধেই তা খাটে না। কারণ মানুষের মধ্যে পুরুষের

আবির্ভাব হয়েছে, আর এই পুরুষের ইচ্ছা শক্তি বা Will বলে' একটা সম্পদ আছে।

আর সেই জন্যেই মানুষের—কি পুরুষ কি নারীর—সুখ দুঃখ শুধু একটা বাহিরের ধরাবাঁধা অবস্থা বিশেষে নয়, সেটা তা'র অন্তরের ইচ্ছার সার্থকতা বা ব্যর্থতা। মানুষের সুখ দুঃখ সম্পূর্ণ Subjective, একটা গরুর সুখের অবস্থাও যা, দশটা গরুর সুখের অবস্থাও তাই, দশ-যুগের গরুর সুখের অবস্থাও তাই। কিন্তু মানুষের সুখ তখনই, যখন তা'র অন্তরের অবস্থা বা মনের বাসনার সঙ্গে বাহিরের অবস্থা খাপ খায়।

উপরে যে কথাগুলো বলা গেল, আশা করি এ সম্বন্ধে সবাই আমার সঙ্গে একমত হবেন।

এখন একটা জিনিস নির্দ্ধারণ করতে চেষ্টা করব, সেটা হচ্ছে অবরোধ প্রথাটা বাঙলায় এল কি করে'। কিন্তু কেউ যেন মনে না করেন যে, আমি একটা বিজ্ঞান-সঙ্গত ঐতিহাসিক গবেষণা বা অনুসন্ধান করতে যাচ্ছি—আমার এ অনুসন্ধানের আশ্রয় হচ্ছে অনুমান-গুণ্ড ইংরেজিতে যাকে বলে—guess-work. এই guess-work এখানে করতে যাচ্ছি এই সাহসে যে, তা'র সিদ্ধান্ত যদি ডাহা ভুলও হয়, তবে এই প্রবন্ধের মূল কথার কিছুই আস্‌বে যাবে না।

বাঙলাদেশে আজকাল দু'রকমের লোক দেখা যায়। এক দলকে সেই দাঁড়কাকের সঙ্গে তুলনা করা যায়, যে দাঁড়কাক ময়ূর-পুচ্ছ লাগিয়েছিল। কারণ তা'র ধারণা ছিল যে, গায়ে ময়ূরপুচ্ছ লাগালেই সে সুন্দর হ'য়ে উঠ্‌বে। এই দলের মানুষও তেমনি

বলে' বেড়ান যে, আমরা হচ্ছি আর্য্য সন্তান। তাঁদের মনের ভাবটা যে, আমরা আর্য্যসন্তান প্রতিপন্ন হ'লে বর্ত্তমান "আমাদের" মহত্ত্বটাও বিনা ক্লেশে বিনা আয়াসে বেড়ে যাবে। তাই যখন এঁরা শোনেন কেউ বল্‌ছে যে, আমাদের শিরায় মঙ্গোলীয় বা দ্রাবিড় শোণিত আছে, তখন তাঁরা বেজায় খাপ্পা হ'য়ে ওঠেন। অন্যদল এ সবকে কিছুই কেয়ার করেন না। তাঁরা বলেন যে, থাক্‌লেই বা আমাদের শিরায় দ্রাবিড় বা মঙ্গোলীয় শোণিত, আমাদের যা মহত্ত্ব তা কাগজে কলমে দেখালে চল্‌বে না, দেখাতে হবে তা হাতে কলমে। অতীতকে নিয়েই খালি হৈ চৈ কর্‌লে নিজেদের সুখ হ'তে পারে কিন্তু অপরের তা'তে ভুল হবে না। কিন্তু যাহোক্ এঁদের এই বাদানুবাদের কোন বিচার আমরা কর্‌ব না—বিশেষত আমরা যখন নৃতত্ত্ববিদ নই। এঁদের দু'দলের মনস্তুষ্টির জন্যে ধরে' নেওয়া যাক, বাঙালীর মধ্যে ও-তিন জাতের রক্তই আছে—আর্য্যেরও, মঙ্গোলেরও দ্রাবিড়েরও। এবং এ-কথাটা সত্য হবারও একটা সম্ভাবনা আছে। কেননা ভারতবর্ষের সকল জাতির মধ্যে বাঙালীর যেমন একটা adaptability আছে—আপনাকে পরিবর্ত্তিত হ'তে দেবার পক্ষে যেমন একটা অসঙ্কোচ ভাব আছে, এমন আর কারও নেই। আর মিশ্র রক্তেরই যে এ রকম চরিত্র হ'য়ে থাকে, এটা নৃতত্ত্ব নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান তাঁদের মুখে শুন্‌তে পাওয়া যায়। কিন্তু এই যে অবরোধ প্রথা, তা আর্য্যদের ছিল না; মঙ্গোলীয়দেরও নেই, দ্রাবিড়দেরও নেই। সুতরাং বাঙ্গালী তা পেল কোথা থেকে? এ প্রশ্নে স্বভাবতই একটা উত্তর এসে পড়ে, সেটা হচ্ছে—মুসলমানদের কাছ থেকে।

এ সম্বন্ধে বাঙলাদেশে একটা প্রচলিত মত আছে সেটা হচ্ছে এই যে, মুসলমানরা বঙ্গীয়-ললনার উপরে অত্যাচার কর্‌ত, তারই ফল হচ্ছে অবরোধ। কিন্তু অবরোধের এই কারণটা সত্যি নয় বলেই মনে করি। কেন করি—তা'র কারণ বল্‌ছি।

একথা আমরা সবাই জানি যে, বাঙলাদেশে মুসলমানদের আমলে সমস্ত দেশটা প্রত্যক্ষ ভাবে হাতে ছিল হিন্দুদের। মুসলমান নবাব বছর বছর নিয়মমত রাজস্ব পেলেই তুষ্ট থাক্‌তেন। কিন্তু দেশের আভ্যন্তরিক শাসনের ভার ছিল হিন্দু-জমিদার বা রাজাদের হাতে। শাসন ও পালনের ভার প্রত্যক্ষ ভাবে ছিল তাঁদেরই হাতে। সুতরাং সেই হিন্দু-জমিদার বা রাজাদের এলাকায় মুসলমানেরা হিন্দু-ললনার প্রতি অত্যাচার আরম্ভ কর্‌ল আর সমস্ত হিন্দুরা জোট বেঁধে তা'র প্রতিকার কল্পে বাঙলার সমস্ত নারী-সমাজকে একদিন অন্তঃপুরে অন্তরীণ কর্‌ল, এটা মান্‌তে মন সরে না। আর যদি ধরেই নেও যে, মুসলমানরা হিন্দু-ললনার উপরে অত্যাচার কর্‌ত, তাহ'লেও ঐ অত্যাচারের প্রতিবিধান কল্পে তা'রা তাদের গায়ের বল, হাতের অস্ত্র, বুকের সাহস—সব ঢেকে রেখে তাদের মা বৌ বোনদের উপরে হুকুম জারি কর্‌ল যে, তাদের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ—এ যদি হয় তবে সেটা মানুষের সম্বন্ধে একটা ভীষণ রকমের নতুন Psychology বল্‌তে হবে—যা মান্ধাতার আমল থেকে মানুষের চরিত্র দেখে দেখে মানা কঠিন। বিশেষতঃ মুসলমান কেবল বাঙলাদেশেই ছিল না—অন্য প্রদেশেও ছিল। সুতরাং আমার বিশ্বাস, একথা নির্ব্বিঘ্নে বলা যেতে পারে যে,

বাঙালী যদি মুসলমানদের কাছ থেকেই অবরোধ প্রথা পেয়ে থাকে, তবে সেটা সে পেয়েছে ভয়ের ভিতর দিয়ে ততটা নয়, যতটা ভক্তির ভিতর দিয়ে। কেমন করে' তা বল্‌ছি।

ঐ যে ভাদুড়ী বংশের রাম ভাদুড়ী যিনি নবাবের অমুখ পরগণার দেওয়ান, বছরে মাইনে পান হাজার মোহর, দু-পা যেতে হ'লে যাঁর পাল্কী চাই, যাঁকে দেখে সাধারণ অসাধারণ গণ্য নগণ্য সবাই তটস্থ, তাঁর গৃহিণী কাত্যায়নী দেবীর ব্যবহারটা হওয়া চাই নবাব অন্তঃ-পুরবাসিনীদের মতো; কারণ সেইটেই যে আভিজাত্যের চিহ্ন, সেটাই যে বড়মানুষী চাল। তাই কাত্যায়নী দেবীর মাথায় অব-গুণ্ঠন চড়্‌ল। আর এই অবগুণ্ঠনের দুঃখের চাইতে একটা বড় সুখ কাত্যায়নী দেবীর মনে বাসা বাঁধল—সেটা হচ্ছে, ঐ আভি-জাত্যের গর্ব্ব—তিনি যে বড়ঘরের গৃহিণী সেই অনুভবের সুখ। আর এই সুখই কাত্যায়নী দেবীর আসল সুখ, কেননা আগেই বলেছি যে, মানুষের সুখ হচ্ছে তা'র অন্তরের বাসনা বা আকাঙ্ক্ষার সার্থকতা, আরও বলেছি যে, মানুষের অন্তরের এই বাসনার পরি-বর্ত্তন ঘট্‌তে পারে—তা'র ইচ্ছাশক্তির জোরে। সেইজন্যে মানুষের সুখ দুঃখ তা'র বাহিরের কোন অবস্থা বিশেষই নয়।

বাস্তবিক এ সত্যের উদাহরণ জগতে অসংখ্য মেলে। চীনে-রমণী যে লোহার জুতো পরে' পা ছোট করে' রাখে, যে-পা দিয়ে অবশেষে হাঁটাই যায় না, এর পিছনে রয়েছে চীনে-রমণীর পা ছোট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সুন্দরী হ'য়ে উঠ্‌ছে—এই মনোভাব। এইজন্যে পা ছোট হওয়ার দুঃখ, হাঁটতে না পারার দুঃখ, তা'র দুঃখই নয়।

আমি নিজ চোখে দেখেছি একটি ছোট মেয়ে নাকের জলে চোখের জলে হচ্ছে হাতে উল্কি পর্‌বার কালে। কিন্তু হ'লে হবে কি ?—ঐ উল্কির সাথে সাথে যে, তা'র হাতখানি সুন্দর হ'য়ে উঠ্‌বে, এই মনের ভাব মেয়েটিকে এমন একটা জগতে নিয়ে ফেলেছে, যেখানে শরীরের ব্যথা মোটেই আসন পায় না। হাতটা কাঁধ থেকে নীচের দিকেই নামা যে সুখের, তা'র প্রমাণ আবশ্যক করে না। কিন্তু ঊর্দ্ধবাহু যে, সেই হাতখানাকে উঁচু করে' ধরে' তাকে শুকিয়ে ফেল্‌ল তা'র পিছনে ঊর্দ্ধবাহুর মনের এই সুখটা রয়েছে যে, ঐ সঙ্গে সঙ্গে তা'র ধর্ম্মজীবন লাভ হচ্ছে—ভগবানের কাছে যাবার পথ সরল হ'য়ে উঠ্‌ছে।

এমনি করেই হয়ত সেকালের ধনী-গৃহিণীবৃন্দের মাথায় অবগুণ্ঠন চড়্‌ল, তাদের অন্তঃপুরের দরজা জানালা বন্ধ হ'ল। আর তারপর "মহাজনো যেন গত স পন্থা" না মান্‌লেও ধনীলোকেরা যা করেন নির্ধনেরাও যে তাই করেন, অন্তত কর্‌তে চেষ্টা করেন এ সত্য আজও দেখা যায়। সুতরাং ঐ ফ্যাসান ক্রমে ক্রমে দেশে ছড়িয়ে পড়্‌ল—এবং দিনে দিনে মাসে মাসে বৎসরে বৎসরে শতাব্দীতে শতাব্দীতে ওটা দেশের মাটী ও নারীর মনকে এমনি করে' জড়িয়ে ধর্‌ল যে, অবশেষে বঙ্গীয় মহিলাদের ওটাই সত্য হ'য়ে উঠ্‌ল—সুতরাং এইটেই সুখের হ'য়ে উঠ্‌ল।

তারপর সুখ দুঃখের কথা। আসলে মানুষ যে অবস্থাতেই থাক না কেন, সেখানেই সে আপনার সুখ দুঃখ সৃষ্টি করে' বসে। কারণ সুখ দুঃখটা মানুষের মনের ধর্ম্ম। মন যতদিন আছে, ততদিন সে

যেখানেই যে-অবস্থাতেই থাক্ না কেন, সেখানেই সে আপনার সুখ দুঃখের আশ্রয় খুঁজে নেবে। মিস্ পাঙ্ক্‌হারস্‌টের দুঃখ—নারীর ভোটে অধিকার মিল্‌ছে না বলে', শ্রীমতী শতদলবাসিনীর দুঃখ—তা'র দড়াহারটা ঠিক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের মেয়ের মতো হয় নি বলে'। যদি বল যে, মিস্ পাঙ্ক্‌হারস্‌টের মধ্যে রয়েছে নারীর পূর্ণতর রূপ, পূর্ণতর প্রকাশ। তাহোক্। শতদলবাসিনী আজ যা, তা'র কাছে নারীর ঐ পূর্ণতার রূপ বা প্রকাশের কোন মূল্যও নেই মানেও নেই। সে এখন যা' তা'র কাছে মিস্ পাঙ্ক্‌হারস্‌টের ভোট না পাওয়ার দুঃখ পাগ্‌লামি, আর মিস্ পাঙ্ক্‌হারস্‌ট আজ যা, তা'র কাছে শতদলবাসিনীর দড়াহার সম্বন্ধীয় দুঃখ ছেলেমানুষী। আমি আগেই বলেছি যে মানুষের সুখ দুঃখ subjective, আসলে সুখ দুঃখ বাহিরেও আছে, ভিতরেও আছে। বাঙালীর অন্তঃপুরেও হাজার হাজার সুখী গৃহিণী মিল্‌বে। সুতরাং অবরোধের ভিতরে দুঃখের একচেটে কার্‌বার—এ কথাটা ঠিক নয়, আর বাহিরে সুখের অবিরাম হিল্লোল, এত বড় মিথ্যে কথাটাও আজ আমরা বাঙলার নারী-সমাজকে বল্‌তে পার্‌ব না।

অবরোধের বিরুদ্ধে যে দুই অভিযোগের কথা প্রবন্ধের গোড়ায় বলেছি, সে দুই অভিযোগ থেকে অবরোধকে বাঁচাতে হ'লে এই সব কথাই বলা চল্‌তে পারে।

৩

আমরা অবশ্য অবরোধের স্বপক্ষে নই। আমরা নারীর অবরোধের বিরুদ্ধে এইজন্যে যে, যেমন পুরুষ তেমনি নারী তা'র পক্ষে দেহ বা মনের রুদ্ধ অবস্থা একটা ঘোর মিথ্যা অবস্থা। সাংসারিক সুখ দুঃখের চাইতেও মানুষের কাছে তাঁর আত্মা বড়, অবরোধ প্রথা নারীর আত্মাকে খর্ব্ব করে বলে'ই তা অসহ্য।

আসলে বাঙলার পুরুষ যেমন কেরাণীগিরি কর্‌বার জন্যেই জন্মে নি—বাঙলার নারীও তেমনি শাস্ত্রবাক্য "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যাঃ" সত্ত্বেও কেবল গর্ভধারণের জন্যেই জগতে আসে নি। আকাশ বাতাসের সঙ্গে পুরুষের যে সম্বন্ধ, নারীরও সেই সম্বন্ধ। আমরা জন্মেছি এই জগতে। ভগবান আমাদের প্রাণ দিয়েছেন নড়্‌বার চড়্‌বার জন্যে—চোখ দিয়েছেন, কৌতূহল দিয়েছেন—ঢুঁড়্‌বার খুঁড়্‌বার জন্যে। কিন্তু এই খোলা জগতটা নারীর জন্যে একেবারে বদ্ধ-পুঁথি করে' রেখে দেওয়ার পক্ষপাতী, আর যেই হোন্—স্বাধীনতার মর্ম্ম যাঁরা একটুকুও অনুভব করেন তাঁরা হবেন না। আর ঐ হচ্ছে সবার চাইতে বড় যুক্তি।

যেটা মানুষের চোখে চোখে থাকে, সেই জিনিসটাই তা'র চোখে পড়ে না। সেই রকম, যে আচার-ব্যবহারগুলো নিয়ে আমরা ঘরকন্না করি, তা'র কোন কোনটা ঘোর বীভৎস হলেও সেই বীভৎসতাটা আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। কিন্তু যখন একটুখানি নিজেকে আল্‌গা করে' দেখ্‌বার চেষ্টা করি—পারিপার্শ্বিকের প্রভাব

থেকে মনকে, আজন্মের সংস্কার থেকে বুদ্ধিকে মুক্ত করে' সহজ স্বাভাবিক চোখে দেখ্‌তে চেষ্টা করি, তখন অদম্য হ'য়ে মনের পাতায় এই ভাব ফুটে ওঠে—কি অমানুষিক অত্যাচার! আমাদের মতোই রক্তমাংসের জীব, আমাদের মতোই যাদের মন আছে, বুদ্ধি আছে, কৌতূহল আছে, চোখ আছে, তাদের এ জগতটাকে সাম্‌না-সাম্‌নি দাঁড়িয়ে দেখ্‌বার অধিকার নেই। যদি নেহাৎ তা'রা দেখ্‌তে চায় ত চোখের সাম্‌নে ঝিলিমিলি ঝুলিয়ে। যখন ঐ চার দেয়ালের কথা স্মরণ করি তখন নিজেরই নিঃশ্বাস যেন রুদ্ধ হ'য়ে আস্‌বার মতো হয়। যদি বল যে, তোমার কাব্যি-কল্পনা রাখ, বঙ্গ-নারীর ও-রকম কারও নিঃশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আসে না। তবে বলি যে, ঐ ত সবার চাইতে বড় দুঃখ, "হাজার বছরের নিষ্ঠুর বাহু তাদের মনকেও পাথরের মুঠোয় চেপে ধরেছে"। আর এই পাথরের মুঠোকে চিরন্তন কর্‌বার জন্যে আমরা কেউ কেউ দেই যুক্তি এবং এই মুঠোকে আল্‌গা কর্‌বার জন্যে আমরা কেউ কেউ করি তর্ক। আমাদের যুক্তি তর্কের আর শেষ নেই।

কিন্তু নারীও যে পুরুষের মতো এ জগতের বুকে খোলা চোখে, মুক্ত মনে বিচরণ কর্‌বে, এটা এত সাদা রকমের সত্য যে, এর কোন যুক্তি খুঁজে পাইনে। আসলে যখন সত্যকে যুক্তি দিয়ে দাঁড় করাই, তখনই সত্যকে খাটো করি। সত্য সব সময়েই নিজ-গুণেই সত্য।

অবরোধকে চিরন্তন করে' রাখ্‌বার জন্যে যাঁরা অনেক অনেক যুক্তি দেন, তাঁদের একটা যুক্তি কেবল একটু প্রণিধানযোগ্য।

তাঁরা বলেন যে, অবরোধের ঐ পাথরের মুঠোকে আল্‌গা কর্‌লে, সমাজে বিশৃঙ্খলা বাড়্‌বে—চরিত্রহীনতা বাড়্‌বে।

প্রথমত—এ যুক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণ আছে। এই ভারতবর্ষেই তামিল বলে' এক জাতি আছে। কি হিন্দু, কি ক্রিশ্চিয়ান তাদের নারী-সমাজে অবরোধ প্রথা নেই। কিন্তু তাই বলে' তাদের সমাজ ব্যভিচারের স্রোতে ভেসে যায় নি—তাদের সমাজ বিশৃঙ্খলায় ত উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে ওঠে নি।

দ্বিতীয়ত—মানুষকে যতটা প্রকৃতিগত উচ্ছৃঙ্খল বলে' ধরে' নেই—মানুষ ঠিক ততটা উচ্ছৃঙ্খল নয়। মানুষের দেহ ছাড়িয়ে প্রাণ, প্রাণ ছাড়িয়ে মন, মন ছাড়িয়ে আত্মা। মানুষ তা'র দেহ থেকে যাত্রা সুরু করে' আত্মার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আজকার মানুষ প্রায় মনের কাছাকাছি এসে পৌঁছেচে। এই মনকে শিক্ষা দিয়ে শিষ্ট করা যায়। আর এই মনকে শিক্ষা দিয়ে স্ত্রী-পুরুষকে চরিত্রবান করাই হচ্ছে পাকা কাজ। স্ত্রী-পুরুষকে আলাদা রেখে তাদের চরিত্রবান করা হচ্ছে গোঁজামিল। গোঁজামিলের পক্ষপাতী যারা, তাজা মন তাদের কোন দিনই লাভ হবে না। তবে পুরুষের মধ্যে শতকরা এক শ' জনাই যেমন ভীষ্ম হবেন না—তেমনি নারীর মধ্যেও শতকরা এক শ' জনাই সাবিত্রী হবেন না। মানুষের কিছুই চৌকষ হয় না—তা'র আর কি করা যাবে? কিন্তু এই চৌকষ না হবার মানেও আছে; কারণ যে অনুষ্ঠানের যেখানে চৌকষ নয় ঠিক সেই খানটায় তা'র অনন্ত সম্ভাবনার বীজ নিহিত।

আসলে বুরোক্রেসি আজ আমাদের ঠিক ঐ কথাটাই বলছে।

তা'রা বল্‌ছে যে, তোমরা স্বায়ত্ত-শাসন পেলে দেশে ঘোর বিশৃঙ্খলা হবে। আমরা কিন্তু সেটা মোটেও মান্‌ছি নে। আর আমাদের এই না-মানাটা ঐ বিশৃঙ্খলা-যুক্তির চাইতে বড়।

ঠিক তেমনি আজ যদি কয়েকজন বিদুষী বঙ্গীয়-মহিলা প্রতিনিধি হ'য়ে বাঙলার পুরুষের পার্লিয়ামেণ্টে এক আর্জ্জি পেশ করেন—বঙ্গনারীর পর্দ্দা তুলে দেবার জন্যে, আর আমরা যদি ঐ বিশৃঙ্খলার দোহাই দেই, তবে সেটাও কি ঠিক ঐ জাতীয় যুক্তি হবে না?

আসল মেয়েরা স্বাধীনতা পেলে যদি সমাজে বিশৃঙ্খলা বা ব্যভিচার বাড়ে, তবে তা থেকে বাঁচ্‌বার জন্যে সমাজকে অন্য উপায় খুঁজে বের কর্‌তে হবে। ঐ আজুগতে মানুষের প্রতি ভগবানের প্রথম দান যা—চোখ মেল্‌বার অধিকার—চোখ মেলে এই জগতটাকে সহজ রূপে দেখে নেবার অধিকার—তা থেকে স্ত্রী-জাতিকে অনন্ত যুগ বঞ্চিত করে' রাখ্‌তে চায় যে, সে বর্ব্বর না হোক, ঘোর স্বেচ্ছাচারী—অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে' despot. এই despotism কি আমাদের সমাজে চিরস্থায়ী হবে?—আজকের দিনে এ কথা বিশ্বাস করা আহম্মকি।

৪

কিন্তু আজ বঙ্গীয়-নারী-সমাজের পক্ষে সবার চাইতে আরামের খবর যেটা, সেটা হচ্ছে এই যে, বাঙলার পুরুষ-সমাজের সবাই স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্যে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ওঠে নি। তা যদি হ'ত আর বাঙলার

সকল পুরুষ যদি তাঁদের আত্মীয়াদের অবগুণ্ঠন টেনে ছিঁড়ে তাঁদের দীপ্ত আকাশের তলে নিয়ে আস্‌তেন তবে সেই আত্মীয়াদের আজ লাঞ্ছনার সীমা থাক্‌ত না। কেননা কোন জিনিসকেই বাহির থেকে পাওয়াই সত্য করে' পাওয়া নয়। ভিতরে যে সত্যের চিহ্ন-মাত্র নেই বাহিরের সেই সত্যের অনুযায়ী আচরণ কর্‌তে গেলে দুঃখই হয়, কারণ সেটা হচ্ছে তখন পরধর্ম্ম।

সুতরাং হাজার কাজ, হাজার চিন্তা, হাজার অনুষ্ঠানের মাঝে আজ যেন আমরা এই কথাটাকে অস্বীকার না করি যে—সত্যই সুন্দর, সত্যই শোভন, সত্যই সহজ। যতক্ষণ এই সত্যকে আমরা অন্তরে গড়ে' তুল্‌তে না পারব, ততক্ষণ সে-সত্যকে আমরা বাইরে সার্থক করে' তুল্‌তে কিছুতেই পারব না। আসলে কোন সত্যই বাহির থেকে পড়ে' পাওয়া যায় না, অন্তর থেকে গড়ে' তুল্‌তে হয়। জীবনে যেখানেই আমরা এই সত্যটাকে অস্বীকার কর্‌ব, সেখানেই আমাদের পরিণামে ঠক্‌তে হবে।

কাজেই আমাদের সমাজের অন্তরে স্বাধীনতা আগে প্রতিষ্ঠা কর্‌তে হবে—তখনই বাহির স্বাধীনতার পক্ষে সহজ হবে, সত্য হবে ও সুন্দর হবে।

এর জন্যে চাই স্ত্রী-পুরুষের মনের গঠন-ভঙ্গীর পরিবর্ত্তন—তাদের শতাব্দীব্যাপী সংস্কারের বিসর্জ্জন, আর তা হবে শিক্ষার ভিতর দিয়ে। শিক্ষার ভিতর দিয়ে যখন মন, চিত্ত মুক্ত হবে তখনই বাহিরের স্বাধীনতা অমৃতময় হবে। কারণ এ প্রবন্ধের আগেই আমি বলেছি যে, মানুষের সুখ স্বচ্ছন্দ তখনই, যখন তা'র

ভিতরের অবস্থার সঙ্গে তা'র বাহিরের অবস্থা খাপ খায়।

কিন্তু সবার চাইতে মানুষের সত্য যা—তা'র স্বাধীনতা—তা'র চোখ মেলে সহজ ভাবে এই পৃথিবীর বুকে মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়াবার অধিকার—সেই অধিকারকে যে মানুষের জীবনে—তা সে মানুষ পুরুষই হোক বা নারীই হোক—শিক্ষা দিয়ে সত্য করে' তুলতে হয়—এর চাইতে মানুষের জীবনে বড় পরিহাসের কথা আর কিছুই নেই।

'বীরবল'

"বীরবল" নামের আড়াল দিয়ে প্রমথ-বাবু যেদিন বাংলার মাসিক সাহিত্যের রণাঙ্গনে প্রথম তীর ছুঁড়্‌তে আরম্ভ করেছিলেন সে দিন সে তীর অনেক অন্যমনস্কের মনেও বিঁধেছিল—কেননা সে তীর অর্জ্জুনের তূণের তীরের মতোই ছিল তীক্ষ্ণ। সেদিন অনেকেই কৌতূহলী হ'য়ে নিজের মনে মনে ও পরের কানে কানে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করছিলেন—কে এই "বীরবল"? তার পর ধীরে ধীরে কানাকানি হ'তে হ'তে ক্রমে ক্রমে জানাজানি হ'য়ে গেল যে, এই "বীরবল" হচ্ছেন বার-য়্যাট্-ল শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়। তারপর থেকে প্রমথ-বাবু স্বনামে ও বেনামীতে বিভিন্ন বিভিন্ন মাসিক পত্রে অনেক প্রবন্ধাদি লিখেছেন এবং তারই অনেকগুলো একসঙ্গে করে' "বীরবলের হালখাতা" "নানা কথা" এই দুখানি প্রবন্ধ-পুস্তক ও "চার-ইয়ারী-কথা" নাম দিয়ে একখানি গল্পের বই বাংলার সাহিত্য-সমাজকে উপহার দিয়েছেন। যা মাসিকের পাতে ছড়িয়ে ছিল তাই যখন বইয়ের পৃষ্ঠায় সংহত হ'ল তখন সে সম্বন্ধে দু' এক কথা বলার অধিকার আমাদের জন্মেছে বলে' মনে করি।

প্রমথ-বাবুর লেখা সম্বন্ধে দু' এক কথা বলা আমরা কর্ত্তব্য

বলেই মনে করি—কেননা বাংলা সাহিত্যের আসরে একদল লেখকের একটা বদ্‌নাম বেরিয়েছে যে, তাঁরা হচ্ছেন "নতুনের দল" —কেউ কেউ "বিশ্বের দল" বলেও এঁদেকে লজ্জা দিতে ও নিজেরা আত্মপ্রসাদ পেতে প্রয়াস পান। প্রমথ-বাবুর লেখা পড়্‌লে মনে হয় যে, তাঁর বয়েস যাই হোক তাঁর মন নবীন—

"ঐ যে প্রবীণ, ঐ যে পরম পাকা,
চক্ষু কর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা,
ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা
অন্ধকারে বন্ধ-করা খাঁচায়"—

তাদের মতন প্রমথ-বাবুর মনের চক্ষু কর্ণ ডানায় একটুকুও ঢাকা নয় —এবং তা'রা অন্ধকারে বন্ধ-করা খাঁচায় বসে' বসে' যে এক দণ্ডও ঝিমায় না, এটা তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে জানিয়ে দেওয়া আছে। কেননা মানুষের দেহের যৌবন এলে' গেলেও মনের যৌবন কি করে' ধরে' রাখ্‌তে হয় তা'র গুপ্ত কৌশল প্রমথ-বাবুর অজ্ঞাত নেই। সে কৌশল প্রমথ-বাবু তাঁর দেশবাসীর কাছ থেকে গোপন করে' রাখেন নি। তিনি স্পষ্ট করে' বলে' দিয়েছেন যে—

"দেহের যৌবনের অন্তে, বার্দ্ধক্যের রাজ্যে যৌবনের অধিকার বিস্তার কর্‌বার শক্তি আমরা সমাজ হতেই সংগ্রহ কর্‌তে পারি। ব্যক্তিগত জীবনে ফাল্গুন একবার চলে' গেলে আবার ফিরে আসে না; কিন্তু সমগ্র সমাজে ফাল্গুন চিরদিন বিরাজ কর্‌ছে। সমাজে নূতন প্রাণ, নূতন মন, নিত্য জন্মলাভ কর্‌ছে। অর্থাৎ নূতন সুখ

দুঃখ, নূতন আশা, নূতন ভালবাসা, নূতন কর্ত্তব্য ও নূতন চিন্তা নিত্য উদয় হচ্ছে। সমগ্র সমাজের এই জীবন-প্রবাহ যিনি নিজের অন্তরে টেনে নিতে পার্‌বেন, তাঁর মনের যৌবনের আর ক্ষয়ের আশঙ্কা নেই।" (বীরবলের হালখাতা—১২৫ পৃষ্ঠা)

সমগ্র সমাজের জীবন-প্রবাহ আপনার অন্তরে টেনে নেবার কৌশল যে প্রমথ-বাবুর হাতে আছে তা'র পরিচয় তাঁর ঐ লেখাতেই পাওয়া যায়। এই কারণেই আমরা তাঁর আসন "নতুনের দলে"ই পাত্‌তে চাই। সুতরাং তাঁর গ্রন্থের পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন। কেননা নতুন যা তা'রই পরিচয় নেওয়া দরকার হয়—পুরাতনের নাড়ী-নক্ষত্র ত সবারই জানা।

প্রমথ-বাবু অসীম সাহস নিয়ে বাংলা-সাহিত্যের আসরে নেমেছেন। তিনি মুখের ভাষাকে প্রাণের ভাষা কর্‌তে চান—অর্থাৎ সাহিত্যের ভাষা কর্‌তে চান। অনেকে হয় ত আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌বেন যে, এতে আর সাহসটা কি? প্রাণের ভাষাই ত মুখের ভাষা! সুতরাং সেই ভাষাই ত সাহিত্যের। কিন্তু ঐ আশ্চর্য্য হওয়ার দল বাংলার আব-হাওয়ার খোঁজখবর রাখেন না। এখানে সকল পণ্ডিত লোকে একমত যে, যে প্রাণের ভাষা আমাদের মুখ দিয়ে বেরয় তা সংস্কৃতের কড়া ইস্ত্রি করে' না নিলে সাধুও হয় না, সাহিত্যও হয় না। সমস্ত পণ্ডিত-সমাজ যার বিরুদ্ধে—তা'র সপক্ষে দাঁড়ান অসীম সাহস ছাড়া আর কি? যে-ভাষা ভদ্র-সমাজে অসাধু বলে' অসম্মানিত প্রমথ-বাবু সেই ভাষাকে—সেই ভাষার সুরকে বঙ্গ-সরস্বতীর বীণার তানে বাজিয়ে তুল্‌তে চান। অবশ্য এই অসাধু ভাষায় যে প্রমথ-

বাবুই প্রথম লিখ্‌ছেন তা নয়—কিন্তু এই অসাধু ভাষাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে' বসাবার মত স্পর্দ্ধা এর আগে আর কারো হয় নি। কেবল তাই নয়। এর আগে এ কথাও আর কেউ বল্‌তে পারেন নি যে, আমাদের বঙ্গ-সরস্বতীর মন্দিরে সাহিত্যের আসন ঐ অসাধু ভাষারই ন্যায্য প্রাপ্য—কেননা ঐ আমাদের মাতৃভাষা। সমস্ত পণ্ডিত-সমাজ যার বিরুদ্ধে প্রমথ-বাবু যে তারি সপক্ষে, তা'র কারণ—মাতৃভাষার সুর তাঁর কানে মিষ্টি লাগে—এবং সে ভাষার গতির মধ্যে তিনি অপূর্ব্ব প্রাণের পরিচয় পান। আমার বিশ্বাস যাদের কান আছে ও প্রাণ আছে তা'রা সজ্ঞানে ও-কথা অস্বীকার কর্‌তে পার্‌বে না। তবে আমাদের অনেকের যে ও-ভাষার সুরের মিষ্টত্ব কানে লাগে না, তা'র কারণ—"আমাদের নব শিক্ষার প্রসাদে, বাঙ্‌লা ভাষার নিজস্ব সুরটি শিক্ষিত বাঙালীর কান থেকে আল্‌গা হ'য়ে গিয়েছে।"

বাঙ্‌লা দেশে এমন এক কাল গিয়েছে যখন মাতৃভাষা বইয়ের ভাষাও ছিল না, মুখের ভাষাও ছিল না—একমাত্র সাধু ভাষা ছিল ইংরেজি। তখন শিক্ষিত যাঁরা তাঁরা সবাই লিখন পঠন কথন যা কিছু কর্‌তেন ইংরেজি ভাষায়। সেই সময়ে বঙ্কিমকে কলম ধর্‌তে হয়েছিল বাংলার শিক্ষিত সমাজকে দেশের ভাষার চর্চ্চায় উদ্বুদ্ধ কর্‌বার জন্যে। নিজ ভাষায় নিজের সাহিত্য রচনা কর্‌বার জন্যে যে বঙ্কিমকে সে সময়ের শিক্ষিত সমাজের কাছে বক্তৃতা কর্‌তে হয়েছিল—আজকাল আমরা সে কথা শুনে অবশ্য আশ্চর্য্য না হ'য়ে যাই নে। এমন একদিন আস্‌বে যে দিন মাতৃভাষার সপক্ষে প্রমথ-

বাবুর যুক্তি তর্ক পড়ে' বঙ্গসন্তানের আর বিস্ময়ের সীমা থাক্‌বে না। এবং যতদূর অনুমান করা যায়, তাদেরও বিস্ময় সসীম হ'য়ে উঠ্‌বে না যখন তা'রা শুন্‌বে যে, প্রমথ-বাবুকে সেই যুগে মাতৃভাষার স্বপক্ষে ওকালতি কর্‌তে হয়েছিল যে-যুগে শিক্ষিত সমাজের অন্তর মাতৃভূমির প্রতি প্রেমে ও ভক্তিতে টল্‌মল্‌ কর্‌ছিল।

২

"A thing of beauty is a joy for ever"—প্রমথ-বাবুর লেখা আনন্দের সামগ্রী, কেননা সে লেখার রূপ আছে। কিন্তু সে রূপ চাঁদের মতো ধার-করা নয়—অর্থাৎ এ-রূপ বিলিতি পাউডার গালে ঘসে' বা সংস্কৃত অলঙ্কার গায়ে চড়িয়ে তৈরি-করা রূপ নয়—এ-রূপ তাঁর ভাষার নিজস্ব দেহের। সেই জন্যে তাঁর লেখা পড়্‌বা-মাত্রই পাঠকের মনের অন্তরে এসে হাজির হয় একেবারে তীরের মতো সোজা—কারণ "অলঙ্কার যে মাঝে পড়ে' মিলনেতে আড়াল করে"—এটা সকল ক্ষেত্রেই সত্য।

কিন্তু ঐ যে তাঁর লেখা অর্জ্জুনের তীরের মতো একেবারে সোজা পাঠকের মনের অন্তরে প্রবেশ করে—মহা-মহা-সন্ধি-সমাস-মণ্ডিত হ'য়ে তা'র বুদ্ধির পিঠে পড়ে না, অনেকের মতে ঐটেই ওর দোষের। আমরা অবশ্য সে-কথা মানি নে। কেননা আমরা জানি যে, সাহিত্যের কাজ মানুষের বুদ্ধির পিঠে পড়ে' তা'কে কাবু করা নয়—সাহিত্যের কাজ হচ্ছে পাঠকের মনকে হয় খুঁচিয়ে তোলা, নয়

নাচিয়ে তা'তে রসসঞ্চার করা। প্রমথ-বাবুর গ্রন্থে ওর দুয়ের ব্যবস্থাই আছে অর্থাৎ তাঁর লেখা পড়্‌লে মন জাগেও বটে মাতেও বটে।

প্রমথ-বাবুর লেখার সুর খাঁটি বাংলা ভাষার সুর—বলাবাহুল্য এ-সুর যে কি তা যিনি নিজের কান দিয়ে না বোঝেন তাঁকে কলম দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া যায় না। তবে এটুকু বলা যায় যে—যে-সুর চণ্ডীদাসের, যে-সুর কবিকঙ্কণের—যে-সুর সংস্কৃত-বহুল হলেও ভারতচন্দ্রের—

কাঁদে বিদ্যা আকুল কুন্তলে
কপালে কঙ্কণ হানে অধীর রুধির বাণে
কি হৈল কি হৈল বলে।

এই লাইনগুলোতে আছে;—এ-সুর—সেই সুর। কিন্তু জগতটা নাকি একটা paradox—তাই দেখ্‌তে পাই অনেকে যাঁরা চণ্ডী-দাস কবিকঙ্কণকে নিয়ে লম্ফঝম্প করে' জগঝম্প বাজান তাঁরাই আবার উল্‌টে ফিরে দাঁড়িয়ে প্রমথ-বাবুর লেখা পড়ে' গলার রগ ফুলিয়ে গালাগালি সুরু করে' দেন। হয় ত এর একটা কারণ আছে—যে-কারণটা নিহিত রয়েছে আমাদের জাতিগত চরিত্রের মধ্যে। চণ্ডীদাস কবিকঙ্কণ এমন একটা কাজ হাতে-কলমে করে' সেরেছেন যা প্রমথ-বাবু কালি-কলমেও কর্‌তে রাজি নন্। প্রমাণ তাঁর লেখা। সেই কাজটা হচ্ছে "ভূ" ধাতুর উত্তর "ক্ত" প্রত্যয়। আর ভূত না হ'লে যে কেউ বা কিছু আমাদের চোখে ধরে' না এটা সর্ব্বলোকবিদিত। কেননা জাতিহিসেবে আমরা সূক্ষ্মদৃষ্টির দল।

কিন্তু আমরা জাতিহিসেবে সূক্ষ্মদৃষ্টির দলই হই আর নাই হই, যেটা আমাদের চোখ ও কান এড়িয়ে যায় না সেটা হচ্ছে প্রমথ-বাবুর লেখার একটি মিষ্টি সুর ও মধুর ভঙ্গী। প্রমথ-বাবুর লেখায় এমন একটা মিষ্টি সুর ও মধুর ভঙ্গী আছে যেটা বাংলা সাহিত্যে একেবারেই নূতন। প্রমথ-বাবু যে একজন মনে ও প্রাণে আর্টিষ্ট তা তাঁর লেখা পড়্‌লেই বোঝা যায়। আমাদের প্রতিদিনকার নিতান্ত আটপৌরে কথাবার্ত্তার যে কি সব গুণ প্রচ্ছন্ন ছিল তা প্রমথ-বাবু টেনে বের করে' দশ জনের সাম্‌নে ধরে' দিয়েছেন। চল্‌তি ভাষাকে যে সাহিত্যের বড় বস্তা ধর্‌লেই একেবারে খোঁড়া হ'য়ে বসে' পড়্‌তে হবে এ-কথা আর আজ কেউ বুকে হাত দিয়ে বল্‌তে পার্‌বেন না। শব্দের দেহায়তন যত বাড়্‌বে অর্থের মূল্যও যে তত চড়্‌বে এ ভুল আমাদের প্রমথ-বাবু ভেঙ্গেছেন। শব্দকল্পদ্রুমের বাইরেও যে চিন্তাশীলতার অবসর আছে তা আমাদের স্বীকার কর্‌তেই হবে।

"বীরবলের হালখাতা" আর "নানা-কথা"র লেখার মধ্যে একটা প্রভেদ আছে, সেটা হচ্ছে এই যে, "নানা-কথা"র প্রবন্ধগুলি গুরু-গম্ভীর—কিন্তু "বীরবলের হালখাতা"র লেখার অন্তরালে অনেক খানে একটা প্রচ্ছন্ন রহস্যের ও ব্যঙ্গের সুর—যাকে ইংরেজিতে বলে satire—ফল্গু-ধারার ন্যায় প্রবহমান। ঐ প্রচ্ছন্ন রহস্য-সুরের ফল্গুধারা এখানে ওখানে যে একেবারে স্পষ্ট হাস্যধারার স্রোতস্বিনী হ'য়ে কল্‌কল্‌ খল্‌খল্‌ করে' না ওঠে, তাও নয়—তা'র নমুনা—"কৈফিয়ৎ" থেকে তুলে দিচ্ছি—

"আমি 'তাহার' পরিবর্ত্তে 'তার' লিখি অর্থাৎ সাধু সর্ব্বনামের হৃদয়ের হা বাদ দি। 'হায়' 'হায়' বাদ দিলে যে বাঙ্গালায় পদ্য হয় না, তা জানি; কিন্তু 'হা হা' বাদ দিলে যে গদ্য হয় না, এ ধারণা আমার ছিল না।"

"বীরবলে"র অনেক গভীর ও গম্ভীর কথাও হাল্কা হ'য়ে এসে কানে লাগে—ঐ রহস্যের সুরের গুণে—কিম্বা দোষেই বোধ হয় বলা ঠিক্। কেননা ঐ কারণেই বোধ হয় অনেক পণ্ডিত লোকের মতে "বীরবলে"র লেখা খোকার হাতের ঝুমঝুমি। King Lear-এর Foolই বল আর As you like itএর Touchstoneই বল তাদের বাইরের চেহারা দেখেই এমন হাসি পায় যে, তাদের মুখের কথার পিছনে যে হাসি ছাড়া আর কিছু থাক্‌তে পারে তা'র সন্দেহ মাত্র মনে জাগে না; আসলে কিন্তু ব্যাপারটা একেবারে উল্‌টো। বিশেষতঃ বীরবলের কলমের আগা দিয়ে সময়ে সময়ে এমনি এমনি সব কথা বেরিয়ে পড়ে যা আদি ও অকৃত্রিম সামাজিকদের ও সাহিত্যিকদের পক্ষে হেসে উড়িয়ে দেওয়াই হচ্ছে সবার চাইতে বুদ্ধিমানের কর্ম্ম—কারণ, নইলে তাদের কাঁদ্‌বার সম্ভাবনা আছে।

চিত্র-শিল্প ও সাহিত্য-শিল্প—এ দুয়ের মধ্যে একটা দিকে মিল আছে। নিপুণ চিত্র-শিল্পীর হাতের আঁকা ঘোড়াটা না নড়ে'চড়েই সে যে বায়ুবেগে ছুট্‌ছে তা জানিয়ে দিতে পারে—নিপুণ সাহিত্য-শিল্পীর লেখাগুলো কাগজের ওপরে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে একটা বেগের সৃষ্টি করে' চলে। প্রমথ-বাবুর হাত থেকে যে-লেখা বেরয় তা কাগজের ওপরে কাঠের পুতুল হ'য়ে ভালোমানুষটির মতো দাঁড়িয়ে

থাকে না। তাঁর লেখার বাক্যে বেগ আছে, সুরে রাগ আছে, অর্থে তেজ আছে। বিপক্ষের শিবিরে এই বেগকেই বলা হয় চাঞ্চল্য, এই রাগকেই বলা হয় চাপল্য, আর এই তেজকেই বলা হয় ঝাঁজ। প্রমথ-বাবুর লেখা সম্বন্ধে বিপক্ষের শিবিরে একটা ভারী কৌতুককর ব্যাপার আছে। সেখানে একদল বলেন প্রমথ-বাবুর লেখা পুরোণো দীঘির জলের মতো কালো—কিছুই দেখা যায় না; আর-একদল বলেন তা পার্ব্বত্য ঝরণার মতো shallow অর্থাৎ অগভীর—এক নজরেই একেবারে তল পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তাই প্রথম দল বলেন তাঁর লেখা বাংলা নয়; আর দ্বিতীয় দল বলেন তা হচ্ছে শিশুর-হাতের ঝুমঝুমি—খুব রঙ্‌চঙ্‌—কিন্তু বাজ্‌বার বেলায় কেবল ঝুম্‌ঝুম্‌। আমাদের মনে হয় ও ব্যাপারের Psychology হচ্ছে এই যে, প্রমথ-বাবু বাংলা সাহিত্যের এতদিনকার ভাষায় পাকা সড়কে সংস্কৃতের পাকা খোয়া তুলে ফেলে বাংলার নরম ও উর্ব্বর মাটি ফেল্‌তে চাচ্ছেন যখন, তখন সনাতনী দলের দিক্ থেকে তাঁর লেখাকে নস্যাৎ কর্‌তেই হবে—তা তা'র উপরে কালো কালি ফেলেই হোক্ বা সাদা চুনকাম করেই হোক্—ফল এক হলেই হলো।

৩

কিন্তু A thing of beauty is a joy for ever হলেও এ জগৎটা ভরা কাজের লোক দিয়ে যাঁরা রূপ ধুয়ে জল খেতে মোটেই রাজি নন। বিশেষতঃ আমাদের দেশে রূপ জিনিসটার একটা

বদ্‌নামই আছে। এই কাজের লোকেরা বল্‌বেন যে, প্রমথ-বাবুর লেখার এতক্ষণ ধরে' কেবল রূপের সুরের ভঙ্গীরই বর্ণনা করা হ'ল—কিন্তু তা'তে সার আছে কি না তা'র খোঁজ নেই। গড়ন গঠন চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে ঝর্‌ঝরে তর্‌তরে হোক্—তা'তে পদার্থ কি আছে? কানে মধু ঢেলে দেয়, চোখে ইন্দ্রধনু এঁকে দেয়—কিন্তু প্রমথ-বাবুর লেখায় মনের খাদ্য কি আছে? সংক্ষেপে Form যাই হোক্ Substance চাই। বলা বাহুল্য এ-চাওয়া অত্যন্ত সমীচীন।

কেননা কাব্য-সাহিত্যের ও প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধর্ম্মে একটা প্রভেদ আছে। কাব্যে মধুর সুর মিষ্টিভঙ্গী ইত্যাদিই অনেকখানি —কাজের লোকেরা যে সার খোঁজেন কাব্যে তা নিতান্তভাবে অপরিহার্য্য নয়। প্রবন্ধ কিন্তু ঠিক্ তা'র উল্‌টো। এমনি উল্‌টো যে, "বীরবল" শ্রীমান্ চিরকিশোরের কাছে এক চিঠিতে প্রবন্ধ জিনিসটাকে জ্যামিতির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। সে যা হোক, অপর পক্ষে যখন পড়ি—

বর্ষ তখনও হয় নাই শেষ
এসেছে চৈত্র-সন্ধ্যা
বাতাস হয়েছে উতলা আকুল
পথ-তরু-শাখে ধরেছে মুকুল
রাজার বাগানে ফুটেছে বকুল
পারুল রজনীগন্ধা,—

তখন ওটাকে চিন্তাশীলতারই হোক্, বা গবেষণারই হোক্ বা পাণ্ডিত্যেরই হোক্—এ সবের নিক্তিতে ওজন করে' দেখ্‌বার

কথা মনে একবারও ওঠে না—ওই ছত্রগুলোর অনায়াস-জাত স্বচ্ছন্দগতি মুক্ত প্রবাহের ভিতর দিয়ে যে একটা ছবি ফুটে উঠেছে সেই ছবির কাছ থেকে যদি বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের dividend কি করে' বাড়ান যায় তা'র একটা পাকা রকমের বাঁধা উপদেশের আব্দার করি তবে এক গালে চুন আর এক গালে কালি মেখে কাব্য-রসিকের সমাজ থেকে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই—কিন্তু প্রবন্ধে, বঙ্গলক্ষ্মী ত বঙ্গলক্ষ্মী ক্ষুদ্র মক্ষিকাটিকে পর্য্যন্ত দোহন করে' কি করে' স্বুবর্ণরেণু আহরণ করা যায় তা'র অধিক হিসেব-নিকেশ থাক্‌তেও কোন বাধা নেই। কাব্য হচ্ছে কবি-আত্মার অনুভব—শব্দ অর্থ ছন্দ ও সুরের ভিতর দিয়ে পাঠকের আত্মায় সংক্রামিত করা; আর প্রবন্ধ হচ্ছে একজনের মনের বোঝা আর একজনের মনে বুঝিয়ে দেওয়া। সুতরাং প্রবন্ধে আমরা খুঁজি আমাদের মনের খাদ্য—বুদ্ধির খাদ্য, আমাদের চিন্তার খোরাক। বলা বাহুল্য প্রমথ-বাবুর গ্রন্থে এই চিন্তার খোরাক খুঁজে নেবার জন্যে চোখে দূরবীন্ লাগাতে হয় না। কেননা প্রতি পৃষ্ঠাতেই তা প্রচুর। তবে তা বুঝ্‌তে হ'লে একটি জিনিসকে ছাড়্‌তে হবে। সেটি হচ্ছে আমাদের কানে যে সাধু বাংলার সংস্কৃত শব্দের ভরাট ধ্বনির একটা মায়া লেগে আছে সেইটি। আমাদের মনের ও কানের এম্‌নি সংস্কার দাঁড়িয়ে গেছে যে—"দিদিমা রাঁধেন চমৎকার" এ বাক্য আমরা অতি সহজেই নেই—কিন্তু "পিতামহী রন্ধনকার্য্যে অতি সুনিপুণা" এ কানে প্রবেশ করবামাত্র মনে হয় যে, অমানুষী পাণ্ডিত্য, অসাধারণ চিন্তাশীলতা ও অসামান্য গবেষণার ফলে ঐ

বাক্যটি জন্মলাভ করেছে—মনে হয় ঐ বাক্যটির পিছনে একটা মস্ত মৌলিকতা রয়েছে—এমন কি একটা original research রয়েছে—original research নিশ্চয়ই রয়েছে—কিন্তু বলা বাহুল্য সেটা নিতান্তই রসনা সম্বন্ধীয়—রচনা সম্বন্ধীয় নয়। অপর পক্ষে—"আমাদের আশা আছে যে, হরিৎ ক্রমে পক্কতা লাভ করিয়া লোহিত বর্ণ ধারণ করিবে। কিন্তু আমাদের অন্তরের অদ্যকার হরিৎ রস কল্যকার লোহিত শোণিতে তবেই পরিণত হইবে, যদি আমরা স্বধর্ম্মের পরিচয় পাই, এবং প্রাণপণে তাহার চর্চ্চা করি"—এ অতি গভীর ও গম্ভীর কথা। কিন্তু ঐ কথাই যদি আবার সহজ করে' বলা যায়—"আমাদের আশা আছে যে, সবুজ ক্রমে পেকে লাল হ'য়ে উঠ্‌বে। কিন্তু আমাদের অন্তরের আজকের সবুজ রস কালকের লাল রক্তে তবেই পরিণত হবে, যদি আমরা স্বধর্ম্মের পরিচয় পাই, এবং প্রাণপণে তা'র চর্চ্চা করি।" *—তবে আমাদের কানের কাছে আর তা'র আভিজাত্যের পরিচয় দিতে হবে না—সুতরাং আমাদের মনের পথে তা'কে কেঁদে ফিরে বেড়াতে হবে। আমাদের এই যে কানের অবস্থা এ অবস্থার কারণ আমাদের মনের সংস্কার। আমরা এই সংস্কারকে ছাড়্‌তে পারি নে, কেননা আমাদের সংস্কৃত শব্দের অলঙ্কারের প্রতি লোভ আছে। কিন্তু শাস্ত্রেই আছে—লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। বাংলা সাহিত্যকে ও বাঙ্গালীর মনকে এই মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানই প্রমথ-বাবুর চেষ্টা।

---

* বীরবলের হালখাতা—১০৬ পৃষ্ঠা।

৪

কিন্তু আসলে প্রমথ-বাবুর লেখায় যদি কিছুর প্রাচুর্য্য থাকে তবে সে হচ্ছে চিন্তার প্রাচুর্য্য—কাজের কথার প্রাচুর্য্য—সার কথার প্রাচুর্য্য। এ সার কথা বাইরের সার কথা নয়—ভিতরের; বাইরের ব্যবস্থা নয়—ভিতরের; ভিতরের যে অবস্থাটি ঠিক্ হ'লে বাইরের সকল ব্যবস্থাগুলি ঠিক হ'য়ে উঠ্‌বে তা'রই কথা—এক কথায় মানুষ হবার কথা। এই জন্যেই প্রমথ-বাবুর সমাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ—"আমরা যে নিজের আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করি নে, তা'র কারণ আমাদের নিজের সঙ্গে আমাদের কেউ পরিচয় করিয়ে দেয় না। আমাদের সমাজ ও শিক্ষা দুই আমাদের ব্যক্তিত্বের বিরোধী। সমাজ শুধু একজনকে আর পাঁচজনের মত হ'তে বলে, ভুলেও কখন আর-পাঁচজনকে একজনের মত হ'তে বলে না। সমাজের ধর্ম্ম হচ্ছে প্রত্যেকের স্বধর্ম্ম নষ্ট করা। সমাজের যা মন্ত্র, তারই সাধন-পদ্ধতির নাম শিক্ষা। তাই শিক্ষার বিধি হচ্ছে 'অপরের মতো হও', আর তা'র নিষেধ হচ্ছে 'নিজের মতো হয়ো না'। এই শিক্ষার কৃপায় আমাদের মনে এই অদ্ভুত সংস্কার বদ্ধমূল হ'য়ে গেছে যে, আমাদের স্বধর্ম্ম এতই ভয়াবহ যে, তা'র চাইতে পরধর্ম্মে নিধনও শ্রেয়ঃ। সুতরাং কাজে ও কথায়, লেখায় ও পড়ায়, আমরা আমাদের মনের সরস ও সতেজ ভাবটি নষ্ট করতে সদাই উৎসুক।" *

* বীরবলের হালখাতা—১০৫ পৃষ্ঠা।

প্রমথ-বাবুর লেখা পড়ে' তাঁর সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে যে কথাটা বলা যায় সেটা হচ্ছে এই যে, তাঁর চিন্তার ধারা পঞ্জিকা ধরে' চলে না। নইলে তাঁর কলমের আগা দিয়ে এই কথাটি কিছুতেই বেরোতে পার্‌ত না যে "যাঁর চোখ নেই তিনিই কেবল সৌন্দর্য্যের দর্শনলাভের জন্য শিবনেত্র হন।" এই আধ্যাত্মিকতার গোঁড়ামির দেশে এত বড় একটা কথার ডঙ্কা মেরে দেবার ব্যবস্থা অবশ্য পঞ্জিকার পাতে নেই। অথচ ঐ কথা শোনাবার ও শোন্‌বার দর্‌কার আমাদের দেশে যেমন, তেমন আর কোন দেশে নয়। কিছুকাল থেকে আমাদের আধ্যাত্মিকতার উপদেষ্টারা 'মানুষ' নামক জীবটিকে এম্‌নি এক ছাঁচে ঢালাই করেছিলেন যাতে করে' সেই ছাঁচটা এম্‌নি প্রকাণ্ড হ'য়ে উঠেছিল যে, তা'র নীচে মানুষটাকে আর দেখাই যেত না—আমাদের মনে হয়েছিল যে, মানুষটা না হলেও চলে—তাই ঐ ছাঁচটাই রক্ষা করবার জন্যে আমরা প্রাণপণ করে' বসেছিলেম। কিন্তু মানুষের সম্বন্ধে যে-কথাটা সবার চাইতে সত্য সেটা হচ্ছে এই যে, তা'র পক্ষে যখনই কোন বিশেষ ছাঁচ সনাতনত্বের কঠিন আবরণ জড়িয়ে শক্ত হ'য়ে ওঠে তখনই তা'র আধ্যাত্মিকতার গোড়া কাটা যায়। মানুষের আধ্যাত্মিকতা তা'র সত্যেই আছে। মানুষের সত্য তা'র বিকাশে ও প্রকাশে—এ বিকাশের এ প্রকাশের শেষ কোন একটা বিশেষ কালে নেই—অতীতেও নেই—বর্ত্তমানেও নেই—ভবিষ্যতেও নেই। এ বিকাশ মানুষের আত্মার আনন্দের বিকাশ—তা'র মনের ভিতর দিয়ে, প্রাণের ভিতর দিয়ে, ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে, শরীরের প্রত্যেক রোমকূপের ভিতর দিয়ে।

শরৎ-উষার ভোরের বাতাস যে শরীরের প্রত্যেক রোমকূপে-কূপে পুলকের স্পন্দন ঢেলে দিয়ে যায়, তা'র আলোতে যে প্রত্যেক শিরা উপশিরা কিসের আনন্দের বেদনায় রি রি করে' ওঠে, চোখ গলে' যায়, প্রাণ ভরে' ওঠে—কারণ মানুষের আত্মার আনন্দ যে অভিসারে বেরিয়েছে—সেই ভিতরের আনন্দ যখন বাইরের আনন্দের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে তখন মানুষও যে ভগবানের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে—তা'র ক্ষুদ্র "আমি" ভগবানের বিরাট "তুমি"র সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আর এই ত চরম আধ্যাত্মিকতা। এই আধ্যাত্মিকতাকে আশ্রয় করেই ত মানুষের জীবন যুগ যুগান্তর ধরে সত্য হ'য়ে আছে—তা'র কর্ম্মে ভোগে নিত্য হ'য়ে আছে—আনন্দময় হ'য়ে আছে। আর এর সাধনা চোখ বুজে নয়, চোখ খুলে—মন খুলে—প্রাণ খুলে—যার ভিতর দিয়ে অন্তরের আলো বাইরেকে উজ্জ্বল কর্‌বে, বাইরের বিচিত্রতা অন্তরকে রঙিন্ করে' তুল্‌বে।

প্রমথ-বাবুর কথা এই খোলা-চোখের কথা—চোখ-খোলাবার কথা। ষোল কোটী ঢুলুঢুলু চোখ, বোজা-বোজা চোখ, আলো-বাতাস-না-সহা চোখ, অতীতের-স্বপ্ন-দেখা চোখ—আজ এই নব-জীবনের উষার বাতাসে খুলে যাক—উদার সুনীল মুক্ত আকাশের তলে খুলে যাক্। তবেই আমাদের জাতীয় জীবনের নবমন্দির গড়ে' উঠ্‌বে, যে "নবমন্দিরের চারিদিকের অবারিত দ্বার দিয়ে প্রাণ-বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের যত আলো অবাধে প্রবেশ কর্‌তে পার্‌বে।"

কিন্তু প্রমথ-বাবুর কথা এই খোলা-চোখের কথা হলেও সে কথা

ভাসা ভাসা দৃষ্টির কথা নয়। তাঁর খোলা-চোখে সেই দৃষ্টি যে দৃষ্টি নিবিড় ও গভীর। এই জন্যেই "দেশের কথা ও দ্বেষের কথা যে এক নয়" এ বানানের পার্থক্য তাঁর চোখ এড়িয়ে যায় না—"অবলীলা ক্রমে লেখা ও অবহেলা ক্রমে লেখা যে এক নয়" তা তাঁর কাছ থেকে শুনি। এই ভিতরের দৃষ্টি আছে বলেই তাঁর কাছ থেকে এমন কথা শুনতে পাই—"মানুষ খারাপ বলে' আমি দুঃখ করিনে—কিন্তু মানুষ দুঃখী বলে' মন খারাপ করি।"

এই খোলা-চোখের গভীর দৃষ্টির কথা সে হচ্ছে নবজীবনের কথা,—যে জীবন অতীতের দিকে অসহায় ও করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে নেই, ভবিষ্যতের দিকে পূর্ণ ভরসা নিয়ে আশান্বিত চোখে চেয়ে আছে। তাই "মানসিক যৌবনই সমাজে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে" প্রমথ বাবুর উদ্দেশ্য। তাই তিনি "নানাকথা"র ছলে "প্রাণের কথা" শুনিয়েছেন। এই প্রাণের কথা শুনে নব্য বাংলার স্নায়ুতে স্নায়ুতে প্রাণ সঞ্চারিত হবে আশা করি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা

আমাদের (?) বিশ্ববিদ্যালয়ের দালানটায় বিশ্বটা এমনি করে' হাত-পা-ছড়িয়ে সমস্ত জায়গা জুড়ে পড়ে' আছে যে সেখানে বিদ্যা-বেচারী একটু দাঁড়াবারও স্থান পাচ্ছে না। তরুণমতি শিশুরা যখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দেউড়িতে প্রবেশ করে, তখন থেকে তাদের তরুণ মনের ওপরে বিশ্বের বোঝাটা এম্নি করে' চেপে বস্তে থাকে যে তা'তে করে' তাদের কাঁচা মন ও দেহ হয় বেঁকতে থাকে, নয় ইঁচড়ে পাক্তে থাকে। তাই যখন তা'রা সেখানে পনর ষোল বছর কাটিয়ে একুশ বাইশ বছর বয়সে এসে রাজার পথে দাঁড়ায়, তখন আমরা বেশ দেখ্তে পাই যে ডিগ্রি পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনুষ্যত্বটাও বিক্রি হ'য়ে গিয়েছে। আর এইটে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম ও প্রধান অভিযোগ।

সবাই জানেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান হয় অনেক বিষয়, কিন্তু আমরা শিখি মাত্র দুটো জিনিস। আমরা তিন চারটে ভাষা, ইতিহাস ভূগোল সাহিত্য গণিত, হরেক রকমের "logy", ফিজিক্স কেমিষ্ট্রী ফিলজফি ইত্যাদি ইত্যাদি করে' অনেক বিষয় সেখানে অধ্যয়ন করি, কিন্তু তা'তে আমাদের মনের জোরও বাড়ে না, বুদ্ধির

জোরও বাড়ে না—জোর বাড়ে আর দুটি জিনিসের—দুঃখের বিষয় দুটোই নিতান্তই দৈহিক—একটি হচ্ছে আঙুলের, আর অপরটি হচ্ছে জিহ্বার। অর্থাৎ আমরা কেউ হই লিখনপটু আর কেউ কথন-পটু। তাই আমরা যখন স্কুল কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি, তখন এই যে দুটি জিনিস আমরা শিখেছি তারি চর্চ্চায় মন দি। তাই আমরা কেউ হই কেরানী আর কেউ হই উকিল ব্যারিষ্টার। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য ডাক্তার হন, কিন্তু সেটা আমা-জাতীয় জীবনের একটা প্রক্ষিপ্ত অংশ বলেই ধর্‌তে হবে; আর আমাদের মধ্যে যে কেউ কিউ ক্বচিৎ কদাচিৎ ব্যবসা বাণিজ্যে মন দেন সেটা একেবারেই নিপাতনে সিদ্ধ; আবার তা'র চাইতেও ক্বচিৎ কদাচিৎ যে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সর্ব্বস্বান্ত হন না সেটা নিতান্তই "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" বলে'—নইলে তা'র আর কোন কারণ নেই।

অনেকে বিরক্ত হ'য়ে মনে মনে বল্‌বেন যে বিদ্যাশিক্ষার কথায় ওকালতি ও ব্যারিষ্টারি বা ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা তুলি কেন? Art for art's sake—knowledge for the sake of knowledge—এ-সব কথা শুন্‌তে শুন্‌তে ত এক-রকম শাস্ত্র-বাক্যের মতোই দাঁড়িয়ে গেছে, তবুও জ্ঞানার্জ্জনের আলোচনায় অর্থ উপার্জ্জনের পন্থার কথা টেনে এনে দুর্জ্জনতার পরিচয় দেই কেন? কিন্তু পাঠক, এর একটু মানে আছে। বল্‌ছি—শুনুন।

পূর্ব্বপুরুষের আমল থেকে আমাদের একটা অভ্যাস জন্মে গেছে—সেটা হচ্ছে আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা—অর্থাৎ

আমরা সবাই বাঁচতে চাই, কেউই মরে' যেতে চাইনে। এই সনাতন ভারতবর্ষে অনেক অনেক আধ্যাত্মিকের মতে এটা একটা নাকি মস্ত কু-অভ্যাস। কিন্তু এ অভ্যাসটা কু না সু সেটা আমরা এখানে বিচার কর্‌তে বস্‌ব না। আমরা শুধুই দেখ্‌তে পাচ্ছি যে এ অভ্যাসটা সত্য, খুবই পুরাতন, সুতরাং চাই কি সনাতন হবারও আটক নেই। মানুষের বাঁচাই দরকার প্রথমে, তারপর তা'র আর যা কিছু তা'র জ্ঞান বিজ্ঞান, ধন ঐশ্বর্য্য, মহত্ত্ব গৌরব সব। সুতরাং এটা সবাই মান্‌বেন যে আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাটাই আমাদের জীবনের প্রথম ও প্রধান কাজ। আর সেই জন্যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়-ফের্ত্তা যুবকবৃন্দের সম্মুখে প্রথম যে কাজটা পড়ে সেটা হচ্ছে এই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা। আর তাঁরা এ কাজটা কে কি রকমে হাসিল্ করেন তা দেখ্‌লেই তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কি হ'য়ে বেরিয়েছেন তা'র একটা হিসেব বেশ পাওয়া যায়।

এই যে আমাদের অধিকাংশেরই কেরানীগিরি ওকালতি বা ব্যারিষ্টারির দিকে ঝোঁক তা'র একটা ভিতরের কারণ আছে। সেটা হচ্ছে এই যে, এই দুটি ব্যবসায়ে আমাদের কিছু গড়ে' নিতে হয় না—কিছু তৈরী করে' তুল্‌তে হয় না। এ-দুটোর রাস্তাই একেবারে পাকা সড়ক—আমাদের পিতৃপিতামহের আমলেও ছিল আবার আমাদের পৌত্র প্রপৌত্রদের আমলেও থাক্‌বে—এখনও যেমন তখনও তেমন—রামেরও আরামলভ্য শ্যামেরও অনায়াসসেব্য। শুধু কেবল একবার এ-রাস্তা ধর্‌তে পার্‌লে হয়—তারপর এখানে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার কোন দর্‌কার নেই, নিজের মাথা খাটানোর কোন

প্রয়োজন নেই, নিজের initiativeএর কোনই তোয়াক্কা রাখ্‌তে হয় না ;—অর্থাৎ মানুষের যা থাক্‌লে মনুষ্যত্ব তা'র কোনই দরকার নেই—কেন না তা'র জোগান দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ পূর্ব্বেই বলেছি যে ডিগ্রির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনুষ্যত্বও বিক্রি হ'য়ে যায়। তাই আমরা যখন "মাষ্টার অব আর্টস"এর তিলোমাখানি বুকপকেটে ফেলে সেনেট-হল থেকে বেরিয়ে এসে গোলদিঘিতে একটু হাওয়া খেতে বসি, তখন অপর পারে সিটি কলেজের মাথার উপরে দু'একটি সদ্য-ফোটা সান্ধ্য-তারার পানে চেয়ে চেয়ে আমাদের পরিষ্কার মালুম হ'য়ে যায় যে art for art's sake একটা কতবড় সত্য কথা।

সুতরাং আমাদের প্রথম ও প্রধান অভিযোগ হচ্ছে যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় মানুষকে মানুষ করে' তুল্‌তে পার্‌ছে না। আর এই অভিযোগটা প্রথমে দাখিল কর্‌লে আর-কোন অভিযোগ আন্‌বার দরকারই হয় না।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কোঠা বাড়ীর অন্ত নেই, বিদ্বান অধ্যাপকের সংখ্যা নেই, অধ্যয়ন অধ্যাপনার সীমা নেই, সাজ সরঞ্জামের ইয়ত্তা নেই, কিন্তু আসল জিনিস যেটা শুধু সেইটে হ'য়ে উঠ্‌ছে না—অর্থাৎ এখানে মানুষ মানুষ হ'য়ে উঠ্‌ছে না। গল্প শুনেছি, সেকালের পাঠশালার গুরু মহাশয়েরা এই বলে' বড়াই করতেন যে তাঁরা কত গাধা পিটিয়ে মানুষ করেছেন ; কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে গাধা ত দূরের কথা, মানুষই মানুষ হ'য়ে বেরুচ্ছে না ;—বেরুচ্ছে হ'য়ে—অতিমানুষ, নয়—অমানুষ। সুতরাং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা

ভীষণ রকমের গলদ কোথাও আছে—আর সেটা বাইরে নয়, এর detailএ নয়, এর উপকরণে অধিকরণে নয়—সেটা এর অত্যন্ত অন্তরে—নইলে বাইরের চূন-শুর্‌কির এতবড় ক্ষমতা নেই যে মানুষকে অমানুষ করে' তুল্‌তে পারে—বিশেষতঃ যখন আমরা জানি যে "অচলায়তনে"ও পঞ্চকের জন্ম হয়। সুতরাং আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়াটি আকাশে ঠিক সোজা হ'য়ে উঠেছে কি না তা দেখ্‌বার আমাদের ততটা দর্‌কার নেই—আমাদের দেখ্‌তে হবে যে এর ভিত্তিটা কোন্ সত্যের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। কারণ প্রত্যেক অনুষ্ঠানের একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম—একটা বিশিষ্ট সত্য আছে। যদি সেই অনুষ্ঠান তা'র সেই বিশিষ্ট ধর্ম্ম—বিশিষ্ট সত্যের ওপরে স্থাপিত না হয়, তবে তা কিছুতেই মানুষকে সফলতা দান কর্‌তে পারে না। কারণ সত্যেই সফলতা নিহিত—অন্যত্র নয়। প্রত্যেক অনুষ্ঠানের একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম আছে যদিও সেটা আমরা অনেকেই মানি না বা জানি না। তাই আমরা কাব্য সমালোচনার কালে টিকি দুলিয়ে যোগশাস্ত্রের সূত্র আওড়াই—আর সাহিত্য বিচারের কালে সাহিত্যিকের রাজনৈতিক মতামতের পিণ্ডির ব্যবস্থা করি।

২

বিদ্যা দান কর্‌বার অধিকার ও সামর্থ্য আছে শুধু একজনের—যিনি ব্রাহ্মণ। কেউ যেন মনে না করেন যে আমি দেউড়ীর দেবতা রঘুবীর তেওয়ারী বা রন্ধনকর্ম্মের ঋষি চক্রধর মিশ্র প্রমুখ ব্রাহ্মণের

কথা বল্‌ছি। আমি বল্‌ছি তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ—যিনি ব্রাহ্মণ পৈতের জোরে নয়, প্রকৃতির জোরে। কারণ জ্ঞানের চর্চ্চা জ্ঞানের আলোচনাতেই ব্রাহ্মণের আনন্দ। আর আনন্দের ভিতর দিয়ে যা দত্ত হয় সেই দানই মঙ্গলময়—সেইটে সবার চাইতে সোজা গ্রহীতার পক্ষে সত্য করে' পাওয়া। ছাত্রের দিক থেকে ত কিছু শেখা অনেক সময়ই কষ্টকর—তারপর শিক্ষকের দিক থেকেও যদি সে-শিক্ষাটা নিরানন্দের ভিতর দিয়েই ছাত্রের কাছে এসে পৌঁছে তবে শিক্ষক ও ছাত্র দু'জনে সারাজীবন খালি অকৃতার্থতার ভিতর দিয়েই কাটিয়ে পরস্পর পরস্পরকে শুধু ঘৃণা কর্‌তেই শিখ্‌বে—তা'তে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই ক্ষতি।

সুতরাং যে বিত্থার মন্দির এই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ওপরে দাঁড়িয়ে না আছে সে-মন্দিরে জ্ঞানের সত্য-বিগ্রহ আপনাকে প্রতিষ্ঠা কর্‌তে পার্‌বে না। আর যেখানে সত্য-দেবতা আপনাকে প্রতিষ্ঠা কর্‌তে না পেরেছে সেখান থেকে মঙ্গলের আশা করা চিরকাল ব্যর্থই হবে। কেননা সত্য ছাড়া মঙ্গল নেই। আর আমাদের বিশ্ববিত্থালয় সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাগুলো খাটে। কারণ আমাদের যে বিশ্ব-বিদ্যালয় তা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ওপরে দাঁড়িয়ে নেই—তা'র ভিত্তি হচ্ছে বৈশ্যবুদ্ধির ওপরে। আর এইটেই হচ্ছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আসল গলদ। এইটে আগে দূর না হ'লে, আর যা কিছু পরিবর্ত্তন হোক্ না কেন, তা'তে একই ফল ফল্‌বে, না হয় একটু উনিশ আর বিশ।

বৈশ্যের ধর্ম্ম নয় কোন কিছু নিঃশেষ করে' দান করা। তবে

প্রত্যেক দানের পিছনে পিছনে তা'র ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির একটা হিসেব থাকবেই থাকবে—তা সে কথায় যতই উদার হোক না কেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়টা যে বৈশ্যবুদ্ধির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে সেটা আমাদের জাতীয় জীবনে নতুন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবার সঙ্গে-সঙ্গে এমন স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে যে সেটা প্রমাণ করতে আর বেশী বিচারতর্কের আবশ্যক করে না। এখন যতদিন এই বৈশ্যবুদ্ধি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভিত্তি থেকে না খসবে ততদিন তা'র দেয়ালে যতই চূনকাম করা হোক্ না কেন তা'তে ছাত্রজীবন একটুও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠবে না।

পরাধীন জাতির দুঃখের অন্ত নেই। তা'র মধ্যে সবার চাইতে বড় দুঃখ হচ্ছে এই যে সে কারও কাছেই সম্মানের দাবী করতে পারে না। সে যখন অপরের কাছ থেকে কিছু পায় সেটাকে সে শ্রদ্ধার ভিতর দিয়ে, ভালবাসার ভিতর দিয়ে পায় না; সেটাকে সে পায় অবজ্ঞার ভিতর দিয়ে—বড় জোর কৃপার ভিতর দিয়ে। আর যে দান অবজ্ঞার দান, সে-দান অমৃত নয়—সে-দান বিষ। তাই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দত্ত জ্ঞান মন্থন করে' অমৃত উঠ্ছে না—উঠ্ছে বিষ। এই বিষে আমাদের ছাত্রমণ্ডলীর দেহ জর্জ্জরিত। তাই যৌবনের প্রারম্ভে যখন তা'রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসে তখন তাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনের চোখে মুখে আমরা দেখ্তে পাই মৃত্যুর নিরানন্দময় ছায়া,—আর বাকি একজন বেরিয়ে আসে নীলকণ্ঠ হ'য়ে রুদ্রমূর্ত্তি নিয়ে। সুতরাং আমার মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা কি শিখি ও কতখানি শিখি সেটা ততবড়

কথা নয় যতবড় কথা হচ্ছে কার কাছে শিখি ও কেমন করে' শিখি।

এই ডেমোক্রেসির যুগে কোন কিছুই কোন একজন ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হ'য়ে উঠ্‌ছে না। যে-কোন অনুষ্ঠানের পিছনেই তাই আজকাল কোন একটা বোর্ড বা কাউন্সিল বা কমিটি কর্ম্ম-কর্ত্তা হ'য়ে রয়েছে। প্রত্যেক মানুষের যেমন একটা আত্মা আছে, তেমনি এই যে বোর্ড কাউন্সিল বা কমিটি—অর্থাৎ মানুষের সমষ্টি-গত অবস্থা—তা'রও তেম্‌নি একটা আত্মা আছে। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্‌রা যখন ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসন-যন্ত্রের British characterএর উল্লেখ করে, তখন তা'রা প্রকৃতপক্ষে ঐ শাসনযন্ত্রের পিছনে যে একটা সমষ্টিগত মানুষের সত্তা আছে তা'রই কথা বলে। এটাকেই আমি বল্‌ছি সমষ্টির আত্মা। এই হিসেবে যেমন আমা-দের গভর্ণমেণ্টের একটা আত্মা আছে তেম্‌নি আমাদের বিশ্ববিদ্যা-লয়েরও একটা আত্মা আছে। এখন এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মা —এই আত্মার মধ্যে সেই জিনিসটি একেবারেই নেই যে-জিনিসটি মানুষকে মানুষ করে' তুল্‌বার আসল মন্ত্র—সেটি হচ্ছে ছাত্রমণ্ডলীর জন্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সহানুভূতি ও প্রচুর পরিমাণে ভালবাসা। এই ভালবাসার অভাব যতদিন থাক্‌বে ততদিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রমণ্ডলী মানুষ হ'য়ে উঠ্‌তে কিছুতেই পার্‌বে না। কারণ স্নেহ ভালবাসা শিশুর পক্ষে যেমন দর্‌কার—বালক কিশোর যুবক সবার পক্ষেই তেমনি প্রয়োজনীয়। একমাত্র ভালবাসার বাতাসেই মানুষ-শতদলটি পরিপূর্ণ রূপে, পরিপূর্ণ গুণে ফুটে উঠ্‌তে পারে।

স্থতরাং যত উঁচু করেই হোষ্টেল গড়া হোক্ না কেন, যত নীচু হয়েই তা'র ছাদে ছাদে ইলেকট্রিক ফ্যান্ ঝুলুক না কেন, পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা যত বাড়িয়ে দেওয়া বা কমিয়ে দেওয়াই হোক্ না কেন, যত ইংরেজী-জানা সংস্কৃত পণ্ডিত বা সংস্কৃত-জানা ইংরেজী মাষ্টার নিযুক্ত করা যাক্ না কেন, যতদিন গোড়ায় ঐ মন্ত্রটির অভাব থাক্‌বে, ততদিন আমাদের পাঠ্যাবস্থা কোন দিন সজীব হ'য়ে উঠে আমাদের জীবন দান কর্‌তে পার্‌বে না। আর ঐ মন্ত্রটির চিরদিনই অভাব থাক্‌বে যতদিন না বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়ার বৈশ্য-আত্মা নবজন্ম লাভ করে' ব্রাহ্মণের আত্মায় পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু যেহেতু এ জগতে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান সাধারণ নিয়ম নয় এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছনে বসে' যাঁরা সুতো টান্‌ছেন তাঁরাও অসাধারণ নন, স্থতরাং এই বৈশ্য-আত্মার ব্রাহ্মণত্ব লাভের আশা অতি সুদূরপরাহত। স্থতরাং বাকি রইল শুধু এক পন্থা—সেটা হচ্ছে আমাদের শিক্ষার ভার বিল্‌কুল নেওয়া আমাদের নিজের হাতে। আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের নিজের হাতে নিয়ে আমরা যে ভুলভ্রান্তিই করি না কেন তা'র পিছনে এমন একটা জিনিস থাক্‌বে যে তা সমস্ত ভুলভ্রান্তির ক্ষতিপূরণ করেও অনেকখানি উদ্বৃত্ত থেকে যাবে। সে জিনিসটা হচ্ছে—আমাদের আপনার জনের জন্যে দরদ, আমাদের উত্তরবংশীয়দের জন্যে প্রচুর পরিমাণে স্নেহ ও ভালবাসা।

৩

বছর বারো আগে এই বাংলাদেশে আমরা একবার আমাদের শিক্ষার ভার বাস্তবিকই আমাদের নিজের হাতে নিয়েছিলেম। কিন্তু তা সত্য হ'য়ে উঠ্‌ল না—হ'য়ে উঠ্‌বার কথাও নয়। কারণ আমরা সেদিন যে বিদ্যার মন্দির খাড়া করে' তুলেছিলেম তা'র আবাহন বীণাপাণির বীণার তানে হয় নি—তা'র উদ্বোধন হয়েছিল রুদ্রের ডমরুর ডিমি ডিমি নাদে। আর রুদ্রদেব যাই হন,—এটা আমরা সবাই জানি—যে তিনি জ্ঞানের দেবতা নন।

উত্তেজনা আর উৎসাহ যে এক বস্তু নয় এটা মান্‌বার মতো মন আর বুঝ্‌বার মতো বুদ্ধি আমাদের অনেকেরই নেই। কিন্তু তাই বলে' উৎসাহ আর উত্তেজনা এক হ'য়ে যায় না। এর প্রভেদ যা তা থেকেই যায়—আর এর ফল যা তা পেয়েই থাকে।

উত্তেজনাটা সাময়িক কোন দুষ্টসাধ্য বা কষ্টসাধ্য কাজ কর্‌বার পক্ষে যতই কার্য্যকরী হোক না কেন, কোন কিছু স্থায়ী গড়্‌বার পক্ষে এর মতো বাধা আর কিছু নেই। যে জিনিসটা এক দিনের নয়, দু'দিনের নয়—কিন্তু চিরদিনের করে' রাখ্‌তে চাই, সেটা চির-দিনের হ'য়ে থাকৃতে পারে শুধু তখনই যখন আমার অন্তর-দেবতার একটা গভীর সত্যের ভিতরে তা'র জন্ম হয়। মানুষের অন্তর-দেবতার যে সত্য, সেই সত্যই স্থিতধী—শক্তিমান—সৎ। মানুষের উত্তেজনা হচ্ছে তা'র স্নায়বিক একটা ওলোট পালোট। এই ওলোট পালোটের মানুষ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সে তা'র অন্তরের

সত্যের সাক্ষাৎ লাভ কর্‌তে পারে না। সুতরাং তখন তা'র পদে পদে সম্ভাবনা সব জিনিসকে একটা বিরাট মিথ্যার ওপরে গড়ে তোলা। আর মিথ্যার ওপরে যা গড়া তা'র ধ্বজা যত উঁচু করেই খাড়া করা যাক না কেন সে ধ্বজা একদিন-না-একদিন ধূলোতে লুটুবেই।

আমরা যে জাতীয়-শিক্ষাপরিষৎ গড়ে' তুলেছিলেম সেটা উত্তে-জনার ভিতর দিয়ে। উত্তেজনার দাপটে ভিতরের সত্যটা আমাদের চোখেই পড়ে নি। জাতীয় শিক্ষাকে আমরা সেদিন শিক্ষার দিক থেকে মোটেই দেখিনি—দেখেছিলেম সেটাকে পলিটিক্সের দিক থেকে। গভর্ণমেণ্টের স্কুল কলেজ থেকে যে আমরা মানুষ হ'য়ে বেরুচ্ছি না সে অভাবটা আমরা সেদিন মোটেও প্রাণ দিয়ে অনুভব করিনি; সেখানে থেকে যে পলিটিক্স করা চল্‌বে না—এইটে ছিল আমাদের জাতীয়-শিক্ষাপরিষদের সত্যময় ভিত্তিটা। রেষারেষি করে' আমরা সেদিন যেটা গড়ে' তুল্‌লেম সেটা অবশেষে হাসাহাসিতেই শেষ হ'য়ে গেল। দ্বেষের ওপরে ভিত্তি করে' আমরা যেটা খাড়া করেছিলেম সেটা স্থায়ী হ'য়ে আমাদের সফলতা দান কর্‌তে পার্‌ল না। কৃতকার্য্য হবার যে রাস্তা—সেটা পরের ওপরে বিদ্বেষের ভিতর দিয়ে নেই, সেটা আছে আপন-জনের প্রতি ভালবাসার ভিতর দিয়ে। পরের উপরে দ্বেষে হয় মানুষের শক্তির বাজে খরচ; এক ভালবাসাই মানুষকে সক্ষম করে গুরুভার বহন কর্‌তে।

শিক্ষা-ব্যাপারের ভিতরের আসল সত্যটা আমাদের অন্তরে সেদিন সত্য হ'য়ে ওঠেনি বলে', আমরা যে গভর্ণমেণ্টের স্কুল কলেজ

থেকে প্রকৃত মানুষ হ'য়ে বেরুচ্ছি না—এই অভাবটা দুঃখের সঙ্গে বেদনার সঙ্গে আপনার অন্তরে অন্তরে গভীর করে' অনুভব কর্‌তে পারিনি বলে' সেদিন আমাদের মনের সাম্‌নে সামান্য সামান্য সমস্যা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাধার মূর্ত্তি ধরে' হিমাদ্রির মতো দাঁড়িয়ে গেল। প্রশ্ন উঠ্‌ল—আমাদের গড়া স্কুল-কলেজে যদি ছেলে পাঠাই তবে ত তাদের মধ্যে হাজারকরা দশজনের যে গভর্ণমেণ্টের দপ্তরখানায় কুড়ি ত্রিশ টাকা মাইনের চাক্‌রী পাবার আশা আছে তা নষ্ট হ'য়ে যায়। আমাদের উত্তেজনা কমার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নের বাধাটা এত বৰ্দ্ধিতায়তন হ'য়ে উঠ্‌ল যে তা'র পাশে আমাদের জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদটা একেবারে ছোট হ'য়ে গেল। কিন্তু সেদিন যদি আমাদের অন্তরে নিশ্চিত মনুষ্যত্ব হারাণোর দুঃখ অনিশ্চিত কুড়ি টাকা হারাণোর দুঃখের চাইতে বেশী সত্য হ'য়ে উঠ্‌ত, তবে আমরা সহজেই এ কথাটা মনে কর্‌তে পারতেম যে মানুষ যদি প্রকৃত মানুষই হ'য়ে ওঠে তবে মাসিক কুড়ি টাকা উপার্জ্জন ত অতি তুচ্ছ কথা, তা'র চাইতে অনেক বড় জিনিস সে উপার্জ্জন কর্‌তে পার্‌বে—নিজের জন্যে বা পরের জন্যে। কারণ মানুষের মনের যুক্তিতর্ক তা'র অন্তরের যে সত্য সেই সত্যেরই পিছনে পিছনে চলে—সেই সত্যেরই মনরাখা ও মানরাখা কথা কয়ে কয়ে। আর এইটে ছিল মূল কারণ যে জন্যে আমরা জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ সেদিন খাড়া করে' তুলে তা দাঁড় করিয়ে রাখ্‌তে পার্‌লেম না।

বারো বছর আগে আমরা বাংলাদেশে যেটা গড়্‌তে গিয়ে ফেল হ'য়ে গেলেম, আজ সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে তারি আয়োজন চল্‌ছে।

এই আয়োজনের সম্বন্ধে সবার চাইতে একটা আরামের কথা এই যে এর পিছনে কোন উত্তেজনা কর্ম্মের দেবতা হ'য়ে বসে' নেই। সুতরাং এই অনুষ্ঠানের সফলতার আশা আজ আমরা অনেক বেশী করে' কর্‌তে পারি। কিন্তু তবুও আজকার বিদ্যামন্দিরও যদি দেশবাসীর হৃদয়ের ওপরে, তা'র অন্তর-দেবতার দুঃখের ওপরে, বেদনার ওপরে গড়ে' না ওঠে তবে পরিণামে এও একটা হাস্যজনক ব্যাপারেই পরিণতি লাভ কর্‌বে।

মানুষ বাস্তবিক যা পায় তা'র চাইতে তা'র পাবার আশার বন্ধন অনেক বেশী। সুতরাং আজ যদি আমরা দেশবাসীকে অঙ্ক কসে একথা বুঝিয়েও দি যে তাদের ছেলেদের মধ্যে শতকরা একজনও গভর্ণমেণ্টের দপ্তরখানায় প্রবেশ কর্‌তে পারে না, তবে তা'তে যে বড় বিশেষ ফল হবে তা বোধ হয় না; যতদিন না তাদের মধ্যে ঐ বিশ ত্রিশ টাকার লোভের চাইতে মনুষ্যত্বের লোভ প্রবল হ'য়ে ওঠে। যতদিন না তাদের অন্তরে মনুষ্যত্বের মূল্য গভর্ণমেণ্টের ত্রিশ টাকার চাইতে বেশী হ'য়ে উঠ্‌বে—যতদিন না তা'রা বুঝ্‌তে শিখ্‌বে যে মানুষের মনুষ্যত্বের মূল্য দেশকালের অতীত, কিন্তু জায়গা-বিশেষের ত্রিশ টাকার মূল্য দেশকাল ও অবস্থার অধীন—যতদিন না তা'রা উপলব্ধি করে যে মানুষ মনুষ্যত্ব অর্জ্জন কর্‌লে তা'র কোন দিনই সংসারে ফাঁকি পড়্‌বার আশঙ্কা নেই—ততদিন জাতীয় শিক্ষার অনুষ্ঠানকে কিছুতেই তা'রা বিশ্বাসের চোখে স্নেহের চোখে দেখ্‌তে পার্‌বে না—ফলে জাতীয়-শিক্ষা-যজ্ঞের হোমানল নিভে যাবার প্রচুর সম্ভাবনা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান হ'য়ে থাক্‌বে।

সুতরাং বাহিরের আয়োজনকেই পরম বলে' মনে না করে' ভিতরের আয়োজনের প্রয়োজনীয়তাও আমাদের প্রাণে প্রাণে অনুভব কর্‌তে হবে। আমাদের দেশবাসীর এমন একটা মন গড়ে' তুল্‌তে হবে যে-মনে মনুষ্যত্বের প্রতি একটা দুর্ব্বার লোভ জন্মে যায়। আর এ-কাজের ভার হচ্ছে সাহিত্যের। কারণ সাহিত্য হচ্ছে একাধারেই যন্ত্র ও মন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে একটা জাতি আপনাকে ব্যক্ত করে—আর এই মন্ত্রের সাহায্যে একটা জাতি আপনাকে গড়ে' তোলে।

'ঘরে বাইরে'

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ * * * 'ঘরে-বাইরে'য় আমাদের জাতীয় সমস্যার ছবি এঁকেছেন, কেননা ও উপন্যাসখানি একটি রূপককাব্য ছাড়া আর কিছুই নয়। নিখিলেশ হচ্ছেন প্রাচীন ভারতবর্ষ, সন্দীপ নবীন ইউরোপ আর বিমলা বর্ত্তমান ভারত।

—বীরবলের হালখাতা

"ঘরে-বাইরে" বইখানা যেদিন ছাপাখানার অঙ্ক ছেড়ে বাইরে বেরুল সেদিন বাংলার ঘরে বাইরে ঐ বইখানা পঠন-পাঠনের সঙ্গে সঙ্গে কারো কারো ঘ্রাণেন্দ্রিয় এমনি কুঞ্চিত হ'য়ে উঠেছিল যে, আমাদের ভয় হয়েছিল যে, কারো বা সেই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের রন্ধ্রপথে বায়ু চলাচল বন্ধ হ'য়ে প্রাণহানি ঘটে; কিন্তু দেশের সৌভাগ্যক্রমে তেমন কোন দুর্ঘটনার দুসংবাদ আমরা এ পর্য্যন্ত পাই নি। নাসিকা কুঞ্চিত হবার কারণ হয়ত ও বইখানিতে যথেষ্টই আছে—কেননা, আমাদের প্রায় প্রত্যেকের মাঝেই যে একজন সন্দীপ মাঝে মাঝে অতি গোপনে উঁকি-ঝুঁকি মারেন, সেই সন্দীপকে দশজনের মাঝে এনে খুলে স্পষ্ট করে' ধরিয়ে দেওয়া কবির অপরাধ নিশ্চয়। কিন্তু

সত্য দেখ্‌তে হবে অপ্রিয় হলেও। বিশেষত যে সত্য সমষ্টিগত; সমষ্টিগত সত্যে কারোই অসম্মান নেই—লাইবেলও নেই।

মানুষের মধ্যে দুটো "আমি" রয়েছে—একটা স্পষ্ট, একটা অস্পষ্ট। কিন্তু মজার কথা এই যে, এই স্পষ্ট আমিটাই হচ্ছে অসত্য আর অস্পষ্ট আমিটাই হচ্ছে সত্য। তাই মানুষের ঐ স্পষ্ট আমিটার কোলাহলে আজ পৃথিবীটা পূর্ণ। যেন ঐ স্পষ্ট আমিটা অন্তরে অন্তরে জানে যে, সে মিথ্যা। তাই তা'র জোর জোর কথা—তাই তা'র জবরদস্তির আর অন্ত নেই—যেন সে প্রতি নিমেষেই প্রমাণ করতে চায় যে সেইই সত্য। তাই সে আপনাকে সব বিষয়েই স্থূল করে' তোলে—পরের নজরে পড়্‌বার জন্যে, আপনার মনে আপনার উপর বিশ্বাস জন্মাবার জন্যে। সে আগে পাছে তুরুকসোয়ার দাব্‌ড়িয়ে চৌঘুড়ি হাঁকিয়ে রাজপথ কাঁপাতে কাঁপাতে "সামনেওয়ালা ভাগো" হাঁক্‌তে হাঁক্‌তে ছুটে চলেছে, কোথায় তা ঠিক নেই; কিন্তু ওম্‌নি করে' সে যে ছুটে চলেছে তা'র অর্থ—কি জানি পাছে কেউ মনে করে' বসে যে, সে মিথ্যা। মানুষের স্পষ্ট "আমি"র রাজাগিরির সহস্র তামাসার মাঝে তা'র অস্পষ্ট "আমি"র মৌন অভিসার কারোই চোখে পড়্‌ছে না—কারোই মনে লাগ্‌ছে না। মানুষের এই স্পষ্ট "আমি" হচ্ছে সন্দীপ আর তা'র অস্পষ্ট "আমি" হচ্ছে নিখিলেশ। সন্দীপ সে হচ্ছে বাইরের মানুষ, নিখিলেশ সে হচ্ছে অন্তরের ঠাকুর।

এখন, শক্তি প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে আছে কোথায়? স্পষ্ট আমির মধ্যে না অস্পষ্ট আমির মধ্যে? মিথ্যা আমির পণ্যশালায়, না সত্য আমির মন্দিরে? বিমলার অন্তরের সত্যতম পূজা নিবেদিত হচ্ছে

রয়েছে কার কাছে—সন্দীপের কাছে, না নিখিলেশের কাছে? তারই একটা ইতিহাস হচ্ছে "ঘরে-বাইরে" বইখানি।

২

মানুষের মধ্যে দুটি শক্তি রয়েছে। একটি "অহং"-এর আর একটি "সোঽহং"-এর। এই "অহং"-এর শক্তিটা কাঁচা, তাই মানুষকে এই শক্তি ধরে' খুব শক্ত হ'য়ে কঠোর মূর্ত্তি নিয়ে সর্ব্বদাই সংগ্রামের বেশে থাকতে হয়—কারণ নিজ কোট বজায় রাখ্‌বার জন্যে প্রতি মুহূর্ত্তে তা'র লড়াই করা দর্‌কার। প্রতি মুহূর্ত্তেই তা'র ভয়, কি জানি তা'র অস্তিত্ব বুঝি কোন্‌খান দিয়ে একটুকু ক্ষুণ্ণ হ'ল। আর "সোঽহং"-এর শক্তি, সে যেন ধীরে ধীরে ফুলটির মত ফুটে ওঠা—সে এমনি অব্যর্থ, এমনি অলক্ষ্য যে, ফুলটিও জানে না যে, সে ফুটেছে। এখানে সংগ্রাম নেই, সংঘর্ষ নেই এখানে এদিককার শক্তিই আপনাকে অপ্রতিহত ভাবে সার্থক করে' তুল্‌ছে।

মানুষের মধ্যে দু'জনার জ্ঞান রয়েছে। একজন হচ্ছে "অহং" আর একজন হচ্ছে "সোঽহং"। "অহং"-এর জ্ঞান সে বাইরেকেই বড় করে' তুলে সেই বাইরের গায়েই অসি চালাতে ছোটে, নয় মসী লাগাতে বসে যায়। মিনিটে মিনিটে তা'র থিওরির বদল হচ্ছে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় তা'র দর্শনের বিজ্ঞানের সংশোধিত সংস্করণ বেরুচ্ছে। আজ সে বলে দাড়ি গোঁফ রাখাটা চলে—কারণ আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে বাতাস নিই, সেই বাতাসের ভিতরকার রোগের বীজাণু-

গুলো আমাদের গোঁফের জালে আট্‌কে পড়ে আর ভিতরে ঢুক্‌তে পারে না। কাল সে বলে দাড়ি গোঁফ না রাখাটা আরও ভাল—কেননা তা'তে করে' রাজ্যের রোগের বীজাণু এসে আমাদের গোঁফের কুঞ্জে বাসা বাঁধে, আর সুযোগ পেলেই নিশ্বাসের সঙ্গে ভিতরে ঢুকে পড়ে। "অহং"-এর এই জ্ঞানসমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে আমরা আজ দাড়ি গোঁফ দুইই রাখ্‌ছি—কাল দাড়ি কামিয়ে গোঁফ রাখ্‌ছি, পর্‌শু গোঁফ কামিয়ে দাড়ি রাখ্‌ছি, জীবনটা কেবল একটা তোড়ের উপরে চলেছে, সুস্থও হচ্ছে না, সুস্থিরও হচ্ছে না। এই হচ্ছে "মডারন্ প্র্যাগ্‌মেটিক্ ম্যান্।"

কিন্তু "সোঽহং"-এর জ্ঞান যেখানে, সেখানে সকল থিওরির সমাপ্তি। সেখানে আছে দিব্যদৃষ্টি, প্রত্যক্ষ দর্শন। সেখানে মানুষ জানে যে আমাদের জীবনটা দাড়ি গোঁফ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না, মন দিয়ে হচ্ছে না, বুদ্ধি দিয়ে হচ্ছে না, প্রাণ দিয়ে হচ্ছে না—এ সবের চাইতে অন্তরতম গভীরতম মানুষের একটা কিছু আছে, যেটা বাইরের দিক থেকে যেমনি অস্পষ্ট, ভিতরের দিক থেকে তেমনি সত্য। যেখানে দিন রাত ঘোষিত হচ্ছে—মানুষ, তুমি দেশ কাল পাত্রের বাইরে, বাইরের অবস্থা তোমাকে গড়ে নি, তুমিই বাইরেকে সৃষ্টি করেছ, জন্ম দিয়েছ। তুমি যুগে যুগে তোমার সেই অন্তরতম দেবতার মন্দিরে যে রঙের আলো জ্বালাচ্ছ সেই রঙেই না তোমার বাইরের জগতের রঙ বদ্‌লাচ্ছে। তোমার বিজ্ঞান তোমাকে জ্ঞান দেয় নি, তোমার দর্শন তোমাকে দৃষ্টি দেয় নি, কারণ এদের জন্মদাতাই যে তুমি—তুমি সেখানে তুরীয়, তুমি সেখানে সমাধিস্থ।

'ঘরে বাইরে'

মানুষের মধ্যে দুরকমের প্রেম আছে। এক হচ্ছে "অহং"-এর আর এক হচ্ছে "সোঽহং"-এর। এর এক প্রেমে সাধনার চাইতে মন্ত্র আওড়ানের ধুম বেশি—ধ্যানের চাইতে স্তবের ঘটা বেশি। এখানে প্রেম আপনার স্বরূপ দেখ্‌তে পায় নি, তাই তা'র অমৃতের সন্ধানও পায় নি। এ প্রেম জ্বলন্ত বহ্নির মতো, মানুষ এতে আপনাকে পোড়ায় পতঙ্গের মতো—বুদ্ধি পোড়ায়, মন পোড়ায়, প্রাণ পোড়ায়, তবুও তা'র মুক্তি নেই, শেষ নেই, তখন তা'র শেষ কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে—"বন্দে প্রলয়রূপিণীং হৃদ্‌পিণ্ডমালিনীং"। এর শেষ কথা রুদ্র—যিনি জ্বলন্ত বহ্নিরূপে লক্‌লক্ লেলিহান রসনা বের করে' ঘরে বাইরে যা কিছুকে স্পর্শ করেন, সবকে কুৎসিত করে' তোলেন—তাঁর সে সর্ব্বগ্রাসী বাসনার দুর্জ্জয় ক্ষুধার কবল থেকে যা বাঁচে তা হচ্ছে কঙ্কাল—সাদা শুক্‌নো কদর্য্য। ব্রহ্মার কমণ্ডলুর স্নিগ্ধ শীতল বারির স্পর্শে যা সঞ্জীবিত হয়েছে, বিষ্ণুর লক্ষ্মীস্বরূপিণী মমতায় যুগ যুগ ধরে' যা ফুলে ফলে পাতায় মুঞ্জরিত হয়েছে, রুদ্রের এক দৃষ্টিতে তা প্রলয়ের মশাল হ'য়ে জ্বলে ওঠে। চরিদিকে ভস্ম আর ধূম, চারিদিকে জ্বালা আর তৃষ্ণা। জীবনের পাতাগুলো দুরন্ত লালসার কদর্য্য আভাসে ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে। প্রাণের তারে মীড় টেনে টেনে সেখান থেকে খন্‌খনে এক অতি কর্কশ আওয়াজ কে বাজিয়ে তোলে—যে আওয়াজে সৃষ্টির সকল শব্দ গন্ধ সকল রূপ সকল রস কোথায় তলিয়ে যায়। কিন্তু রুদ্রই ত এ সৃষ্টির শেষ কথা নয়। রুদ্র মানুষের চৈতন্য-দেবতার চরম সত্য নয়। তাই সেখানে তা'র চরম সুন্দরও নেই, চরম মঙ্গলও নেই।

আর এক রকমের প্রেম—যা আপনার মনকে আপনাকে পেয়েছে, তাই সেখানে সে বাহিরকে অস্বীকার করে' বাহিরকেও পেয়েছে। যেখানে মন্ত্র না থাক্‌তে পারে কিন্তু মন আছেই—যেখানে স্তবের চাইতে ধ্যান আছে—যেখানে বাইরের আড়ম্বরের চাপে ভিতরের পূজা মারা পড়ে নি, বাইরের শঙ্খঘণ্টার হট্টগোলে ভিতরের বাণী চাপা পড়ে নি। প্রেম এখানে আত্মপ্রতিষ্ঠ।

এই হচ্ছে সন্দীপ আর নিখিলেশের ইতিহাস। সন্দীপের মিথ্যা বিজয়ের দুন্দুভি আজ যত জোরেই বাজুক না কেন, তা'র অতি মোটা আঙুলের রূপ-স্পর্শে বিমলার প্রাণের তন্ত্রীতে যে দীপক রাগিণীই আজ বেজে উঠুক না কেন, বিমলার শেষ সেখানেই নয়। ঐ মোটা আঙুলের আড়াল দিয়ে, ঐ বিজয়-দুন্দুভির উন্মত্ত প্রলয়ের সমক্ষে নিখিলেশের যুগযুগান্তরের মৌন প্রতীক্ষা বিমলার অন্তরে গিয়ে জমা হ'য়ে উঠ্‌ছে। বিশ্বের বেদনা দিয়ে নিখিলেশের বক্ষ ভরে' থাক—তা'র চোখের অশ্রুতে সপ্ত-সিন্ধুর বিরাট গহ্বর ভরে' উঠুক। কিন্তু শেষ কথা তারই। তাই বিমলাকে ফির্‌তেই হবে—একদিন দেখ্‌তেই হবে যে ঐ দীপক রাগিণীর মধ্যে সে-ই আছে আর কেউ নেই—ও একটি বিরাট মিথ্যার ব্যাপার। যেখানে "দূরে একটি শিমুল গাছ অন্ধকারে কঙ্কালের মত দাঁড়িয়ে আছে—তা'র সমস্ত পাতা ঝরে গিয়েচে—তা'রই পিছনে সপ্তমীর চাঁদ ধীরে ধীরে অস্ত গেল"—সেইখানে দাঁড়িয়ে বিমলাকে একদিন বল্‌তে হবে "আমার হঠাৎ মনে হ'ল আকাশের সমস্ত তারা যেন আমাকে ভয় করচে—রাত্রি বেলাকার এই প্রকাণ্ড জগৎ আমার দিকে যেন আড়চোখে

চাইচে! কেননা আমি যে একলা। একলা মানুষের মতো এমন সৃষ্টি-ছাড়া আর কিছু নেই। যার সমস্ত আত্মীয় স্বজন একে একে মরে' গিয়েচে সে-ও একলা নয়, মৃত্যুর আড়াল থেকেও সে সঙ্গ পায়। কিন্তু যার সমস্ত আপন মানুষ পাশেই রয়েচে তবু কাছে নেই, যে মানুষ পরিপূর্ণ সংসারের সকল সঙ্গ থেকে একেবারে খসে' পড়ে' গিয়েচে মনে হয় যেন অন্ধকারে, তা'র চোখের দিকে চাইলে সমস্ত নক্ষত্র-লোকের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমি যেখানে রয়েচি সেখানেই নেই—যারা আমাকে ঘিরে রয়েচে আমি তাদের কাছ থেকেই দূরে। আমি চল্‌চি ফির্‌চি বেঁচে আছি একটা বিশ্ব-ব্যাপী বিচ্ছেদের উপরে যেন পদ্মপাতার উপরকার শিশির বিন্দুর মত।" বিমলাকে ফির্‌তেই হবে—আজ না হয় কাল—কাল না হয় পর্‌শু—সেইখানে যেখানে সে পূর্ণ সত্য, পূর্ণ সুন্দর, পূর্ণ মঙ্গল।

এই হচ্ছে বিশ্বমানবের অন্তরের ইতিহাস—অন্তরের আরব্ধ সাধনা।

৩

বিশ্বের সকল অন্তরতম বাণী ছাপিয়ে আজ ঘরে বাইরে সন্দীপের স্থূল কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে—"আমি যা চাই তা আমি খুবই চাই।" কি চাই? কেন চাই?—তা'র কোন ঠিক নেই। কিন্তু তা'র চাইতেও বড় সমস্যা হচ্ছে—কে চায়? তাই আজ আমরা সাহস করে' এই প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করি—সন্দীপ! কে চায়? তোমার মধ্যে যিনি

দেবতা আছেন তিনি—না—যিনি দানব আছেন তিনি? তোমার মধ্যে যিনি সবার চাইতে সত্য, মানুষের উপরে যাঁর দাবী সবার চাইতে বড় এ-চাওয়া তাঁর—না যিনি পুঞ্জীভূত ক্ষুধার মাঝে বসে' প্রতি নিমেষে মরণের সূক্ষ্ম জাল বুন্‌ছেন এ-চাওয়া তাঁর? এ-চাওয়া তোমার অন্তর-দেবতার নিভৃততম মন্দিরে যিনি যুগ যুগ ধরে' দীপ জ্বালিয়ে বসেছেন তাঁর আশীর্ব্বাণীর ভিতর থেকে ফুটে উঠেছে—না —এ-চাওয়া যিনি আকুল তৃষ্ণায় শুষ্ক কণ্ঠে আপনার তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে সহস্র আকাঙ্ক্ষা সহস্র দিকে মেলে দিয়ে অমৃতের নিষ্ফল সন্ধান কর্‌ছেন তাঁরই উন্মত্ত বিকারোক্তি থেকে জেগে উঠেছে? তোমার মধ্যে যিনি চরম সত্য চরম সুন্দর চরম মঙ্গল এ-চাওয়া তাঁরই গোপনতম বার্ত্তা—না আর কিছু? হে সন্দীপ! তোমার জীবনের ইতিহাসে শেষ পৃষ্ঠাটি লিখিত হবে তোমারই জ্বালা-মশালের নির্ব্বাপিত-শেষ ভস্ম-রেখায়—না শরৎ-উষার প্রথম বালারুণের কনকরশ্মি-লেখায়?—সন্দীপের মধ্যে যে অমৃতের পুত্র আছেন, সন্দীপ তাঁর খোঁজ পায় নি, তাই তা'র চাওয়ার মধ্যে এমন রূঢ়তা।

সন্দীপের বাণী সে হচ্ছে নবীন ইয়োরোপের বাণী।

ইয়োরোপের এই বাণী দিকে দিকে ছড়িয়ে গেল—অতুল ঐশ্বর্য্য সম্পদ নিয়ে অসীম শক্তি নিয়ে সত্যরূপে ঐ বাণী বিশ্বমানবের অন্তরে আপনার আসন প্রতিষ্ঠিত কর্‌লে। আমাদের চোখ যে সব ঝল্‌সে গেল। ঐ যে ধনৈশ্বর্য্য ঐ যে বিরাট জনসঙ্ঘ পদভরে মেদিনী কাঁপিয়ে চলেছে, দিগ-দিগন্তের পারে পারে বিশালকায় অর্ণবযান-বাহিনী সপ্ত-সিন্ধুর বুকে ভাসিয়ে কোন্ অনন্তের পানে ছুটে চলেছে!

ওই যে—মৃত্যু ওদের চরম দুর্ঘটনা নয়—কর্ম্ম ওদের বোঝা নয়—ভোগ ওদের পাপ নয়! জীবনকে যেমন ওরা আলিঙ্গন কর্ছে—মরণকেও তেম্নি কর্ছে। এই ত মুক্তি—এই ত মুক্তি—এই ত জীবন—যেখানে মানুষ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে' অমর হয়েছে—কর্ম্মকে, ভোগকে সম্মান করে' শক্তিমান হয়েছে। ইয়োরোপের চিত্রপট কনকরেখায় অঙ্কিত হ'য়ে জগতের চোখের সাম্নে ফুটে উঠ্ল। ঐ কনকরশ্মিপাতে আমাদের দুর্ব্বল চোখ ঝল্সে গেল। আমরা ওর বাইরে আর কিছু দেখ্তে পেলেম না, শুন্তে পেলেম না, বুঝ্তে পেলেম না—যেটা আমাদের চর্ম্মচোখের সাম্নে এমনি রাজার বেশে এমনি স্পষ্ট হ'য়ে এমনি জোর করে' খাড়া হ'য়ে আছে সেই-টেকেই আমরা সত্য বলে' নতশিরে মেনে নিলেম। নিখিলেশ তা'র বুক-জোড়া বেদনার পাহাড় নিয়ে চোখভরা অশ্রু-সাগর নিয়ে কোথায় কোন্ নিভৃতে অপেক্ষা কর্ছে, কবে মানুষ তা'র দিকে কান ফেরাবে মন ফেরাবে চোখ ফেরাবে মুখ ফেরাবে—কবে বিশ্বমানব দানব হবার উদ্যোগ না করে' দেবতা হবার সাধনা আরম্ভ কর্বে।

এই যে সন্দীপের চাওয়া—এই যে ইয়োরোপের চাওয়া, এ একটা মিথ্যা চাওয়া; কারণ এ-চাওয়ার মধ্যে ইয়োরোপই আছে আর কেউ নেই—একটা মস্ত মিথ্যা ব্যাপার। তাই ত ইয়োরোপের বিজ্ঞানের প্রদীপ কোন্ এক নিশীথ রাতের নিস্তব্ধতার মাঝে আকাশ-জোড়া পুঞ্জীভূত মেঘের বুকের তড়িতের স্পর্শে এক নিমেষে প্রলয়ের মশাল হ'য়ে জ্বলে' উঠ্ল—তা'র হাতের লেখনী কোষের অসি হ'য়ে জেগে উঠ্ল। এ চাওয়া যেখানে যত নিষ্ঠুর

আঘাত করে' বেদনা জাগিয়ে তুলেছে—সেই সকল বেদনা জমা হ'য়ে উঠে ইয়োরোপকে ফিরে আঘাত কর্‌ল—আঘাত কর্‌বেই প্রকৃতির বিচার, ভগবানের বিচার—সে-বিচারের গতি যত মৃদু যত মন্থরই হোক্ না কেন, তা অতি সূক্ষ্ম ও অতি অব্যর্থ।

এই কথাটাই ত মদমত্ত সংসারের কানে কানে নিখিলেশ বল্‌তে চায়। কিন্তু মত্ত কোলাহলের মাঝে তা'র সে মৃদুকণ্ঠস্বরে কে কান পাৎবে? আমি একা নই—এইটেই যে সত্য। যে-মুহূর্ত্তে আমার মঙ্গল আমার পাশে যে রয়েছে তা'র অমঙ্গলের উপরে প্রতিষ্ঠিত হ'ল, সেই মুহূর্ত্ত থেকে যে আমার মঙ্গলের মৃত্যু-শরও প্রস্তুত হ'য়ে উঠেছে। আমি একা নই—এইটেই যে সত্য। আমার চলা সে যে বিশ্বের চলা। বিশ্বকে পিছনে বসিয়ে রেখে চল্‌তে গেলেই যে পদে পদে তাদের নিষ্ফলতা আমার পায়ে শৃঙ্খল হ'য়ে গ্রন্থি ফেল্‌বে। আমার সুখ যখন অন্যের দুঃখ মন্থন করে' উঠ্‌ছে—আমার ধন ঐশ্বর্য্য সুখ সম্পদ গৌরব বিভবের ভিত্তি যখন অন্যের দীনতা ও হীনতার উপরে, বেদনা আর অশ্রুর উপরে—তখন সে বেদনা সে অশ্রু একদিন আমাকে বহন কর্‌তেই হবে। কারণ হাজার বৈচিত্র্য হাজার স্বাতন্ত্র্য হাজার প্রভেদ হাজার কলহ সংগ্রাম সমস্তকে উপেক্ষা করে' সমস্তকে ব্যর্থ করে' দিয়ে একটি অতি গোপনতম ঐক্যসূত্র বিশ্ব-মানবের প্রত্যেক জীবনটিকে গ্রথিত করে' রেখেছে, সেই ঐক্য-সূত্রটি কোন রকমে ছিন্ন হয় না। এই ঐক্য-সূত্র বিশ্বপিতার প্রেমে অক্ষয় হ'য়ে রয়েছে।

আমরা আজ প্রার্থনা কর্‌ব, যেন ঐ ঐক্য-সূত্রটি আমাদের

চোখ এড়িয়ে না যায়। ভারতবর্ষ যেন বিশ্বপিতার ঐ প্রেমের অসম্মান কোন দিনই না করে। বিশ্বের কল্যাণ নিয়ে যেন ভারতের কল্যাণ আপনাকে সফল করে' তুল্‌তে পারে। যে কল্যাণের মাঝে সকল সত্য সুন্দর হ'য়ে উঠ্‌বে—সকল সত্য মহান হ'য়ে উঠ্‌বে। যে কল্যাণ লক্ষ লোকের বেদনার উপরে আসন পাতে নি, যে সত্য লক্ষ চোখের অশ্রুজলে আপনাকে অভিষিক্ত করে নি, যে সুন্দর বিশ্বের আনন্দ দিয়ে গড়ে' উঠেছে। বিশ্বমানবের সভ্যতার প্রথম-বলা এই ভারতবর্ষের কণ্ঠেই ফুটেছিল—বিশ্বমানবের সভ্যতার শেষ সমস্যার নিরাকরণও যেন এই ভারতবর্ষের অন্তরেই আগে হয়—যে সমস্যার নিরাকরণে বিশ্বমানব আপনাকে চিরসত্য চিরসুন্দর চিরমঙ্গলে প্রতিষ্ঠা কর্‌তে পারবে। বিশ্বমানবের শেষের কথাটা যেন ভারতবর্ষই পৃথিবীকে দান কর্‌তে পারে। এই আজ আমাদের স্বপ্ন হোক্।

৪

জগতে যা কিছু দেখ্‌ছি—যা কিছু ঘট্‌ছে—তা সে যতই অসত্য যতই অসুন্দর যতই অমঙ্গলময় হোক্ না কেন—সে সমস্তের পিছনেই একটা সত্য আছে—সে সমস্তই আসলে কোন-না-কোন সত্যের বিকৃতরূপ। দানবের দানবত্ব আসলে দেবতা হবারই একটা মিথ্যা পথে বিকৃত প্রয়াস।

সন্দীপের অনেকখানেই গলদ, কিন্তু তা'র মধ্যেও একটা সত্য

আছে। তা'র গল্পের ভিতর দিয়ে সেই সত্যই বিকৃত হ'য়ে প্রকাশিত হচ্ছে।

ইয়োরোপের মধ্যে একটা সত্য আছেই।

কি এ সত্য? সন্দীপের—ইয়োরোপের হাজার রূঢ়তা হাজার অসুন্দরতার ভিতর দিয়ে কোন্ সত্য আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি? দেখ্‌তে পাচ্ছি আমরা মানুষের জীবন—মানুষের দুর্ব্বার কর্ম্ম-প্রেরণা—তা'র জীবনে অসীম ভোগ-সামর্থ্যের আভাস—তা'র জ্বলন্ত উৎসাহ, জ্বলন্ত উদ্যম—ধরিত্রীর কাছ থেকে তা'র আনন্দ আদায় কর্‌বার সামর্থ্য। দেখ্‌তে পাচ্ছি আমরা ইহলোকে মানুষের লীলা-বিলাস। তবে এই কর্ম্ম ভোগকে মন্থন করে' যে অমৃত না উঠে বিষ উঠ্‌ল তা'র কারণ "অহং"-এর কর্ম্ম "অহং"-এর ভোগ। এ-কর্ম্ম এ-ভোগ সারা বিশ্বের আশীর্ব্বাদ নিয়ে কল্যাণময় হ'য়ে ওঠে নি, বিশ্ব-মানবের প্রেম নিয়ে শুদ্ধ হ'য়ে ওঠে নি, এ কর্ম্ম এ ভোগ নিখিলেশের জ্ঞান ও হৃদয় দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় নি।

ঐ দিক থেকেই সন্দীপ সত্য—ইয়োরোপ সত্য। ইয়োরোপের এ সত্যও মানুষের সত্য। যে মানুষ এ সত্যকে, আর কর্ম্মকে ভোগকে একেবারে অস্বীকার কর্‌বে তা'রও অমৃত না মিলে মিল্‌বে বিষ। সে বিষে সেই মানুষদের সমাজের প্রাণের নাড়ী অসাড় হ'তে বাধ্য। এ দেশে একদল লোক বল্‌বেন—কর্ম্মটাই থাক্, ভোগটা আর কেন? ওটা আমাদের সনাতন আধ্যাত্মিকতার বিরোধী। কিন্তু এই সৃষ্টি মানেই ভোগ—এই লীলা মানেই শব্দ গন্ধ রূপ রস—তা'র অনুভূতি—তা'র অনুভূতির আনন্দ। সুতরাং

তা অস্বীকার করা মানে সৃষ্টিই অস্বীকার করা। আসলে কর্ম্মে ও ভোগে এমন একটা সম্বন্ধ আছে যে, যিনিই ভোগ বাদ দিয়ে কর্ম্মকে বা কর্ম্ম বাদ দিয়ে ভোগকে আশ্রয় কর্‌বেন তাঁরই কর্ম্মভোগ হবে। কেননা কর্ম্মকে বাদ দিয়ে ভোগ—সে হচ্ছে চুরি। এ চুরির কোন সংজ্ঞা মানুষের পিনালকোডে না থাক্‌লেও, এর মস্ত একটা ধারা প্রকৃতির পিনালকোডে সৃষ্টির আদি থেকে লেখা রয়েছে। এর শাস্তি একদিন না একদিন দেশের দশজনকে নিতেই হবে। আর অপরপক্ষে ভোগ বাদ দিয়ে কর্ম্ম, সে হচ্ছে মজুরিহীন বেগার খাটা —তা'তে করে' দু' একদিন কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়—কিন্তু যুগ যুগান্তর চলে না।

কিন্তু এই কর্ম্ম ও ভোগকে নিজের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে তা'র প্রতিষ্ঠা করতে হবে নিখিলের সত্যজ্ঞানের উপরে। বিমলার যে সন্দীপের প্রতি টান, সে টানের পিছনেও একটা সত্য আছে। এই সন্দীপে আর নিখিলেশে যখন মিলন হবে—নিখিলেশের অন্তর-দেবতার উপরে যখন সন্দীপের ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হবে, তখনই বিমলার পূর্ণ শক্তি মুক্ত হবে—তখনই বিশ্বমানবের পূর্ণ সত্য প্রকট হবে। আমরা প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিকতার উপরে নবীন ইয়োরোপের কর্ম্ম ও ভোগকে প্রতিষ্ঠিত করে' বর্ত্তমান ভারত গড়ে' তুলব। তখনই তা সত্য হবে—চিরআনন্দে; নিত্য হবে—চিরমঙ্গলে; মুক্ত হবে—চিরসুন্দরে।

নূতন ও পুরাতন

আজ যেটাকে আমরা পুরাতন বল্‌ছি এমন একদিন গিয়েছে যখন সেটা নতুনের মুকুট মাথায় দিয়ে এসে তরুণের বুকে বুকে পুলক সঞ্চার করে' গিয়েছিল—আর আজ যেটাকে আমরা নতুন বল্‌ছি এমন একদিন আস্‌বে যখন সেটাকে আপনা-আপনি পুরাতনের জীর্ণকন্থার অন্তরালে ধীরে ধীরে লুকিয়ে যেতে হবে। তাই আজ স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি পুরাতন খালি পুরাতনই নয়—নতুনও খালি নতুনই নয়। পুরাতনের সার্থকতা নূতনে আর নূতনের জন্ম পুরাতনেই। এই সত্য দেখ্‌তে পাচ্ছি বলেই, আজ আমরা নতুনকে আলিঙ্গন কর্‌তে কিছুমাত্র ভীত বা কুণ্ঠিত নই। যে ক্রমাগত যুগ যুগ ধরে' আমাদের দিকে অগ্রসর হ'য়ে আস্‌ছে আমাদেরও ত'ার দিকে অগ্রসর হ'তে হবে নইলে আমাদের সত্যিকার মিলন কিছুতেই হবে না। তাই আমরা আজ নতুনেরই হাত ধরে', বুকের পঞ্জরে পঞ্জরে যে বিদ্যুৎ ছুট্‌ছে, হৃদয়ের তলে তলে যে রক্তধারা বইছে তারি তালে তালে চল্‌ব। এ নতুন যে আমাদের সেই পুরাতনেরই দান। এ দান অগ্রাহ্য করে' পুরাতনের অপমান কর্‌তে আমর পার্‌ব না।

এই নতুনকে যারা অগ্রাহ্য করবে তা'রা নিজেকেই অগ্রাহ্য করবে—আর যারা নিজেকে অগ্রাহ্য করবে তা'রা অপরের দ্বারা গ্রাহ্য হবে না, নিশ্চয়। তাদের দিকে তাকিয়ে সবার আগে হাস্বে সেই পুরাতন যাকে তা'রা বাঁচিয়ে রাখ্তে চেয়েছিল। পুরাতনকে সনাতন করে' যারা জীবন কাটাতে চাইবে তাদের জীবন কাট্বে বটে কিন্তু তাদের মহত্ত্ব কোন দিনই ফুট্বে না। আর তাদের ঘরে লক্ষ্মীই হ'ন সরস্বতীই হ'ন কোন দিনই আস্বেন না। কারণ দেব-দেবীদের সবারই চিরযৌবন। তাঁরা আসেন সেইখানে যেখানে তাজা প্রাণের তাজা আনন্দ দিয়ে মন্দির তৈরী করা হয়েছে। আর তাজা প্রাণের তাজা আনন্দ নতুনের মধ্যেই আছে। পুরাতনের মধ্যে যা আছে সেটা প্রাণের আনন্দ নয় সেটা হচ্ছে প্রাণের আরাম। আর আরাম জিনিসটা আনন্দের ঠিক উল্টো দিক।

পুরাতনই যে সনাতন নয়—বরং সনাতন, পুরাতন ও নূতন এ দুটোকে নিয়ে—এ যারা বুঝ্বে জগতে জয় হবে তাদের। আর যারা পুরাতনকে সনাতন নাম দিয়ে "অচলায়তন" গড়ে' তুল্বে তা'রা মানুষের অমর্য্যাদা কর্বে, এ-সৃষ্টির অমর্য্যাদা করবে—তাদের ভাগ্যে যা মিল্বে সেটা ইহলোকেরও ভুক্তি নয়, পরকালেরও মুক্তি নয়। কারণ ভুক্তি ও মুক্তি এ দুটোই নিহিত রয়েছে মানুষের প্রকৃতিতে।

আজ যে আমরা পিছনে পড়ে আছি তা আমরা, নতুনের সঙ্গে পা ফেলে' ফেলে' চল্তে পারি নি বলে', নতুনের ডাক শুনি নি বলে'। পুরতনেরই গায়ে সিঁদুর চন্দন ঘসে' ঘসে' তা'কে আমরা

উজ্জ্বল করে' রাখ্‌তে চেষ্টা করেছি—সে পুরাতনের ভিতর থেকে যে কখন প্রাণ বেরিয়ে গিয়ে সেটা ধীরে ধীরে "মাম্মিতে" পরিণত হয়েছে তা আমাদের চোখেই পড়ে নি। পুরাতনকে সনাতন করে' আমরা মনুষ্যত্বকে আয়ত্ত কর্‌বার চেষ্টা করেছি—কিন্তু পুরাতনের অত্যাচারে, পচা সিঁদূর আর চন্দনের গন্ধে "মানুষ" যে কখন আমাদের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ে' কোথায় চম্পট দিয়েছে তা আমাদের লক্ষ্যেই আসে নি। আমরা মনে করেছি—বেশ হচ্ছে, ঠিক হচ্ছে, সনাতনত্বের বাতিটা আমরাই ঠিক জ্বালিয়ে বসে' আছি।

এই নূতনের বার্ত্তা যেখানে যেখানে মান পায় নি সেখানে সেখানেই মানুষের ভাগ্যে জুটেছে শুধু অপমান। পৃথিবীর ইতিহাসে এর বড় বড় উদাহরণ আছে। আমরাও যদি এই নতুনের বার্ত্তা না শুনি, এই নতুনের সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলে' চল্‌তে না শিখি তবে এমন একদিন আস্‌বে যখন আমরা জাতিকে জাতি এ ধরাধাম থেকে চলে যাব—আর সেটা নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করে' নয়—সজ্ঞান-দুঃখ ভোগ করে' করে'।

যারা নতুনের মধ্যে কোন সত্যেরই সন্ধান পেয়ে ওঠে না তা'রা যে এ জগতটাকে অসত্য বলেই ঘোষণা করবে তা'তে আর বিচিত্র কি? কারণ তাদের কাছে সত্য আর কোথাও নেই, শুধু এক শূন্যে ছাড়া; যেহেতু শূন্যেরই কোন পরিবর্ত্তন নেই। আর যারা শূন্যেই তাদের সব সত্য প্রতিষ্ঠা করে' বসে' আছে তাদের যে এ জগতে লাভের ঘরে চারিদিক থেকে খালি শূন্যই জমা হবে সেটা নিতান্তই ন্যায় বিচার। তাদের কথায়, আচারে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, মর্ম্মে

শুধু সেই শূন্যই রকমফের হ'য়ে ফিরবে। এই শূন্যকে পুঁজি করে' কোন জাত কোন দিন বড় হ'তে পারে নি। আর গণিতশাস্ত্রের এ কথাটা ত সবারই জানা আছে যে যত কোটীই হোক্ না কেন তা'কে শূন্য দিয়ে গুণ কর্‌লে তা'র যা গুণফল হয় সেটা শুধু শূন্য।

নূতনের মধ্যে আমরা কোন সত্যকে দেখি নে বলে' আমরা শৈশবকে হাস্‌তে দিই নে, কৈশোরকে খেল্‌তে দিই নে, যৌবনকে চঞ্চল হ'তে দিই নে। কিন্তু যৌবনের চাঞ্চল্যেই যে চঞ্চলা বসে' আছেন জগতের ইতিহাসে এটা এ পর্য্যন্ত কোথাও অপ্রমাণিত হয় নি। শিশুর মুখের হাসি শুখিয়ে উঠ্‌লে, কৈশোরের বুকের নৃত্য থামিয়ে দিলে, যৌবনটা অচঞ্চল হ'তে বাধ্য। কিন্তু সে অচঞ্চলতা বিরাটও নয় স্বরাটও নয়। সে অচঞ্চলতা হচ্ছে আনন্দহীনের, প্রাণহীনের—সুতরাং অক্ষমতার। আমরা যে শিশুর জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে তা'কে একটা পুরাতনের খোলস পরিয়ে দিই, সেটা শিশু যৌবনে পৌছোলে তা'র গায়ে এমনি করে' এঁটে বসে, যে তা'তে মরণ-পথের যাত্রীর যতই সুবিধে হোক্ না কেন জীবন-পথের যাত্রীর পক্ষে সেটা মস্ত অবিচার। যৌবনে যে আনন্দহাসি প্রাণে প্রাণে খেল্‌ছে তা খসিয়ে নিয়ে মানুষকে বার্দ্ধক্যের আরাম-প্রয়াসী করে' তুল্‌লে এ জগতের কর্ম্ম-ব্যঞ্জনা ত তা'কে পীড়া দেবেই—এবং বিশ্বব্যাপী এই বিরাট লীলা তা'র চোখে অসত্যই হ'য়ে উঠ্‌বে, আর নির্ব্বাণ মুক্তিটাই যে আকাঙ্খ্য হ'য়ে উঠ্‌বে তা আমরা চোখের সাম্‌নেই দেখ্‌তে পাচ্ছি।

কিন্তু সবার চেয়ে আশার কথা হচ্ছে এই যে, জগতের ইতিহাসে

নতুনের পরাজয় কোনখানে হয় নি—আর সেই নতুনের ডাক আজ বাংলা দেশে এসেছে। এই নতুনের ডাকে বাংলাকে সাড়া দিতেই হবে—কারণ নতুনের যে শক্তি তা'র মধ্যে গতি আছে আর জীবন্ত মানুষ গতিই চায়। আর গতিশীল মানুষেরই ক্ষতির সম্ভাবনা কম। যদি বা কোন ক্ষতি হয় তবে সেটাকে গতির বেগে একদিন-না-একদিন ভেসে যেতেই হবে—কিছুতেই চিরকাল টিঁকে থাক্‌তে পার্‌বে না। এই জন্যই আমরা গতির এত পক্ষপাতী। গতির খাতায় মানুষের লাভ-লোকসানের জমা-খরচে কখনও ফাজিল দাঁড়ায় না।

তবুও পিছনে পড়ে' থাক্‌বার জন্যেই যারা জন্মগ্রহণ করেছে তা'রা থাক্। তাদের টেনে চল্‌তে গেলে রাস্তার ভারই বাড়্‌বে, গতির বেগ বাড়্‌বে না কিছুতেই। বিশেষতঃ এই যে পিছনের টান—এই যে পুরাতনের শক্তি তা আপনার অজ্ঞাতসারে নতুনকে অগ্রসর করে' দেওয়ার এত সাহায্য করে' যে আর কিছুতেই তেমন করে না। গান কর্‌তে কর্‌তে যেমন গলা খোলে, বিপরীত শক্তিকে পরাভূত কর্‌তে কর্‌তে তেমনি শক্তি খোলে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে পুরাতন যে-রকম বাধা বলেই মনে হোক্ না কেন, প্রকৃত পক্ষে সে নতুনকে সাহায্য করেই চলেছে। সুতরাং পুরাতনের যে শক্তি তা থাকা শুধু যে বাঞ্ছনীয় তাই নয়, তা অত্যন্ত ভাবেই প্রয়োজনীয়।

প্রথমে এই নতুনকে অল্পকয়েকজনই আলিঙ্গন কর্‌বে। কারণ প্রথম প্রথম নতুনের যে শক্তি তা'তে ভার চাই নে—তা'তে চাই

ধার। নতুন বোঝা নয়। সে ভার দিয়ে পুরাতনকে চেপে রাখ্‌তে চায় না। সে চায় ধার দিয়ে পুরাতনের বন্ধন কেটে দিতে। এক এক করে' যখন পুরাতনের সমস্ত বন্ধন কাটা পড়ে যাবে, সমস্ত পূর্ব্ব-অর্জ্জিত সংস্কার থেকে সে মুক্ত হবে তখনই—আর সত্যও দেখ্‌তে পাবে সে তখনই। আর যে দিন সত্য দেখ্‌তে পাবে সে দিন পুরাতন হাসি মুখে এসে নতুনের পাশে দাঁড়াবে ও গৌরব করে' বল্‌বে—নতুন, সে ত আমিই গড়ে' তুলেছি—সে ত আমারই দান।

সমাপ্ত